মোঃ শাওন হোসেন রাজু স স্ক্যান

কথামেলা

কিশোর থ্রিলার

কিশোর গোয়েন্দা

ক্যারিবিয়ানের জলদস্যু

রকিব হাসান

বাংলাদেশী তিন তরুণ গোয়েন্দা
অনিক • আবীর • হিপো।
দুঃসাহসী। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়।
রহস্যভেদের বিপজ্জনক নেশায়
ঘুরে বেড়ায় দেশে দেশে।

কথামেলা

প্রকাশক:
মো: আবদুর রউফ বকুল
কথামেলা প্রকাশন
৩৮/৪ (৩য় তলা), বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০
মোবাইল:
০১১-০১৭৪৬৪

প্রধান নির্বাহী
মোঃ হান্নান খান মুকুল

পরিবেশক:
ক্যামলট বুক স্টল
কমলাপুর রেলস্টেশন, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব:
লেখক

প্রথম প্রকাশ:
জানুয়ারি, ২০০৫

প্রচ্ছদ:
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ:
স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স
৬ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০
মূল্য: বত্রিশ টাকা

ISBN 984-8321-44-6

'কথামেলা' থেকে প্রকাশিত
এই লেখকের আরও কিছু বই:
নতুন গোয়েন্দা
বনবিড়ালের গোরস্থান
গোয়েন্দা কাহিনী
খেপা দৈত্য
কিশোর গোয়েন্দা
কাটামুণ্ডুর দেশে
হিমছড়ির দানব
হাসকির গর্জন
ড্রাগনের নিঃশ্বাস
মৃত্যুমুখোশ
হীরার চোখ
কিশোর সাইন্স ফিকশন
ভিনগ্রহের পিশাচ
নীল যোদ্ধা
আসছে:
কিশোর গোয়েন্দা
শিকারী বাজ
কানা কুমিরের গুপ্তধন
কিশোর সাইন্স ফিকশন
ভারেকের থাবা
রোমান্টিক থ্রিলার
পাপের হাসি

মোঃ শাওন হোসেন (রাজু)
বই নং ৮৪
তারিখ ২৯-০২-২০০৮
ব্যাক্তিগত লাইব্রেরী
২৯শে বই মেলা-০৮ এর
স্মরনে।

আমাদের প্রকাশিত বই

কিশোর থ্রিলার
রকিব হাসান
বনবিড়ালের গোরস্থান * বেপা দৈত্য
কিশোর গোয়েন্দা:
রকিব হাসান
কাটামুণ্ডুর দেশে * হিমছড়ির দানব * হাসকির গর্জন * ড্রাগনের নিঃশ্বাস * মৃত্যুমুখোশ *হীরার চোখ
কিশোর সাইন্স ফিকশন:
রকিব হাসান
ভিনগ্রহের পিশাচ, নীল যোদ্ধা
ওয়েস্টার্ন :
শওকত হোসেন
সীমান্তভূমি * আক্রান্ত খামার * অবরুদ্ধ পথ ১,২ * উপদ্রুত এলাকা * ভূমিগ্রাস * শত্রুরা আসছে! * মৃত্যুগিরি * ঘাতকের পদচিহ্ন * বিস্মৃত শত্রু * খরা * ঘৃণা * খোঁজ * ধূর্ত ঘাতক
মাসুদ আনোয়ার
আধিপত্য
তানভীর হাসান
টেন ওয়াগনস
কিশোর থ্রিলার * দুই বন্ধু :
শামীম হোসেন
গোপন সঙ্কেত * ওখানে যেয়ো না
গল্প :
ফারুক আহমেদ
তিন তরুণের গল্প
রোমাঞ্চোপন্যাস :
শওকত হোসেন
তিক্ত বড় দিন
আত্মোন্নয়নমূলক :
মোস্তাক আহমাদ
সাফল্য সবার জন্য

অনুবাদ :
গন উইদ দ্যা উইন্ড
মূল : মার্গারেট মিচেল, অনুবাদ : শওকত হোসেন
ক্যাপ্টেন গ্র্যান্টস চিলড্রেন
মূল : জুলভার্ন, অনুবাদ : শামীম হোসেন
এমা
মূল : জেন অস্টেন, অনুবাদ : শামীম হোসেন
আলী ও নিনো
মূল : কুরবান সাঈদ, অনুবাদ : বুলবুল সরওয়ার
রোমান্টিক :
সন্ধ্যাতারার পারে * ময়ূরী মন * নূপুর * তুমি যেয়ো না * চলোনা ঘুরে আসি * ভালোবাসা ভালো নয় * কি করে তোমায় ভুলি! * শত্রু তুমি বন্ধু তুমি * স্বপ্নচারিণী * মেঘের আড়ালে চাঁদ হাসে * আমার কষ্টের ভালোবাসা * ভ্রমরের ফুল * দেবী ও পাপী * একমুঠো ভালোবাসা
কিশোর গল্প কথা
মেছো ভূত * সাপের মণি * নেংটি ইঁদুরের দুঃখ * বাটালী হিলের গিরগিটি * দুষ্ট জ্বীনের গল্প * সিংহ কন্যার বিয়ে * গেদু চাচা * ইরিয়ান জায়ার জঙ্গলে * কাঠুরিয়ার বুদ্ধি * ভূতের রাজ্যে বসবাস * ছদ্মবেশী সাপুড়ে * ভয়ঙ্কর এক মানুষখেকো
ছড়া : ছন্দ প্রলাপ
ঐতিহাসিক : একাত্তরের বীর বাঙালি * নারীমুক্তি আন্দোলনের খণ্ডচিত্র
বিজ্ঞান বিষয়ক :
মোস্তাক আহমদ
*বিচিত্র বিজ্ঞান

মোঃ শাওন হোসেন রাজু স স্ক্যান

এক

'আহ্, ম্যান, এই না হলে জীবন!' সাদা পাউডারের মত বালিতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে আবীর। ভাল নাম আবীর ইউসুফ। সতেরো বছরের তরুণ। সুঠাম দেহ। স্মার্ট। সুদর্শন। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা। চুলের রঙ লালচে। চঞ্চল স্বভাব। আবেগপ্রবণ। গরম মগজ।

মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল সে। শুক্লপক্ষের কাস্তের মত বাঁকা চাঁদটা ঝুলে রয়েছে যেন রাতের আকাশের গায়ে। তাকিয়ে রইল সেদিকে।

আবীরের দিকে তাকাল তার বন্ধু অনিক রায়হান। বয়েস আবীরের চেয়ে বছরখানেক বেশি। উচ্চতাও বেশি এক ইঞ্চি। তবে ওজন কয়েক কেজি কম। আবীরের মতই স্মার্ট। ঠাণ্ডা মেজাজ। বুদ্ধির ধারও বেশি। চুলের রঙ কালো। ব্যায়ামপুষ্ট পেশিবহুল শরীর দুজনেরই।

আবীরের ভুল শুধরে দিল অনিক, 'ভুল বললি, আবীর। ক্যারিবিয়ানের লোকেরা ম্যানকে "ম্যান" বলে না, বলে "মান"।'

'ঠিক হ্যায়, মানই সই।' অন্য সময় হলে হয়তো তর্ক করত আবীর। নানারকম যুক্তি দিত। বলল, 'কোন কিছু নিয়েই মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করছে না এখন।'

'আমারও না,' ব্যাকপ্যাকটাকে বালিশ বানিয়ে ওটার গায়ে হেলান দিয়ে বসল অনিক।

'আরে, কাদের মুখে কী শুনছিরে! অনিক-আবীর মাথা ঘামাতে রাজি না! মাথা ঘামানোটাই যাদের একমাত্র কাজ!' ব্যঙ্গ করে বলল ওদের বন্ধু আরিফুল ইসলাম হিপো। বয়েস আবীরের সমান। তবে এত মোটা আর থলথলে দেহ, ভুঁড়িটুড়ি সব মিলিয়ে ছোটখাট একখান জলহস্তী বলে চালিয়ে দেয়া যায়। আর সেকারণেই বন্ধুমহলে তার ডাকনাম হয়ে গেছে হিপোপটেমাস, সংক্ষেপে হিপো। তবে নাম কিংবা শরীর, কোনটা নিয়েই কোন দুঃখ কিংবা মাথাব্যথা নেই তার। খাবার পেলেই খুশি। খেতেও পারে প্রচুর। বেশ কয়েকটা জটিল রহস্য সমাধানে অনিক-আবীরকে সহায়তা করেছে সে।

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের সেইন্ট লুসিয়া দ্বীপে গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে এসেছে ওরা। উঠেছে হিপোর এক চাচার বাড়িতে। অন্যান্য ব্যবসার পাশাপাশি এয়ার-ট্যাক্সির ব্যবসা করেন তিনি।

মাত্র দু'ঘণ্টা আগে দ্বীপে পৌঁছেছে ওরা। পৌঁছে আর দেরি করেনি। বাংলোতে ভারি ব্যাগ-সুটকেসগুলো রেখে শুধু অতি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস ভর্তি ব্যাকপ্যাক পিঠে বেঁধে সোজা চলে এসেছে সৈকতে।

সাগর থেকে আসা ঝিরঝিরে বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে গেল নারকেল পাতার ডগা। কয়েক গজ দূরে সৈকতের বালিকে বার বার চুমু খেয়ে যাচ্ছে ছোট আকারের ঢেউ। মধুর আওয়াজ। সম্মোহিত করে ফেলছে ওদের।

'বড়ই শান্ত, তাই না?' আবীর বলল। 'পরিবেশটা দারুণ!'

'কোনই সন্দেহ নেই তাতে,' জবাব দিল অনিক।

'একারণেই দুনিয়ার তাবৎ লোক ক্যারিবিয়ান বলতে অজ্ঞান। খুব

ভাল লাগছে আমার। স্কুল নেই, লেখাপড়ার ঝামেলা নেই, নেই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গোয়েন্দাগিরির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া।'

'বললি তো শুনলাম,' মুচকি হেসে বলল হিপো। 'কিন্তু তখনই তোর এসব কথা বিশ্বাস করব যখন দেখব সত্যি সত্যি শান্ত লক্ষ্মী ছেলে হয়ে আছিস। তোদের আমি বিশ্বাস করি না। চুপচাপ থাকা তোদের স্বভাবে নেই। কোনভাবে একটা গোলমাল কিংবা রহস্যের গন্ধ পেলেই হয়, ঠিক গিয়ে ঝাঁপ দিবি ওর মধ্যে।' দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সে।

বন্ধুত্ব ছাড়াও আরও একটা পরিচয় আছে অনিক-আবীরের। দুজনে খালাত ভাই। আমেরিকার ইয়েলো বিচে মামা-খালার সঙ্গে থাকে। ওখানকার হাই স্কুলেই লেখাপড়া করে। মামাও শখের গোয়েন্দা।

'খুব তো আমাদের বলা হচ্ছে,' হিপোকে বলল আবীর। 'তুই নিজে কি কম? বিপদে জড়াস না নিজেকে?'

'জড়াই। আপনাআপনি যদি পড়ে যাই সেই বিপদটাতে। তোদের মত ইচ্ছে করে বিপদ খুঁজতে যাই না।'

দূরে কথার শব্দ শুনে ফিরে তাকাল অনিক। সৈকতে পানির কিনার ধরে এগিয়ে এল দুজন লোক। দুজনেরই বয়েস সাতাশ-আঠাশমত হবে। রোদে পোড়া চামড়া। লম্বা লম্বা চুল। একজনের চুল সোনালি, অন্যজনের হালকা বাদামী।

গোয়েন্দাদের কাছে এসে থামল। সোনালি-চুল লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'কি, বেড়াতে এসেছ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল আবীর।

'কেমন লাগছে?'

'খারাপ না।'

'বসে বসে করছটা কী এখানে?'

'সমুদ্রের ঢেউ গুনছি।'

'ভাল। গোনো। গুনতে থাকো। জানো, যে ঢেউগুলো গুনছ তোমরা তার তলায় কি ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক জিনিস রয়েছে?' বলল দ্বিতীয় লোকটা। ইংরেজি উচ্চারণ আর টান শুনে বোঝা যায়, আমেরিকান।

'আর কী থাকবে, হাঙর। ক্যারিবিয়ান সাগর হাঙরে বোঝাই...'

'হাঙরের কথা বলছি না।'

কৌতূহল হলো অনিকের। 'তো কিসের কথা বলছেন?'

'ডুবো জাহাজ।'

'সাবমেরিন?'

'উঁহু! তা-ও না। ডুবো বলতে আমি এখানে ডুবে থাকা ভাঙা পুরানো জাহাজের কথা বলছি। কত জাহাজ যে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে ডুবে আছে ওই পানির নীচে। অন্যের কথা শুনে নয়, নিজের চোখে দেখে এসে বলছি। মাছধরা জাহাজ থেকে শুরু করে বিলাসবহুল ইয়ট, কী নেই! এখান থেকে মাইল চারেক দূরে একটা প্রবাল প্রাচীর আছে। খারাপ আবহাওয়ায় জাহাজের জন্য মারাত্মক হয়ে ওঠে জায়গাটা।'

'শুনেছি,' হিপো বলল, 'দ্বীপে নাকি একদল গুপ্তধন শিকারী এসে আস্তানা গেড়েছে। বহুকাল আগে ডুবে যাওয়া একটা জলদস্যুর জাহাজের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আপনারা সেই দলের লোক না তো?'

পিচ্ছিল হাসি হাসল সোনালি-চুল লোকটা। 'ও, শুনেও ফেলেছ। গোপন রাখার এত চেষ্টা করলাম, লাভ হলো না। ছোট্ট এই দ্বীপে কথা বড় দ্রুত ছড়ায়। জেনেই যখন ফেলেছ, মিথ্যে আর বলব না।

হ্যাঁ, আমরা জলদস্যুর জাহাজটা খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছি।' এক মুহূর্ত থামল লোকটা। 'এই দেখো। বকবক করেই চলেছি, অথচ পরিচয়টাই দেয়া হয়নি এখনও।' হাত বাড়িয়ে দিল সে, 'আমি ডিক।' সঙ্গের বাদামী-চুল লোকটাকে দেখিয়ে বলল, 'ও টম।'

নিজেদের পরিচয় দিল অনিক। শখের গোয়েন্দা ওরা, কথাটা ইচ্ছে করেই জানিয়ে দিল। লোকগুলোর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য। এবং তাতে অসফল হলো না। ওদের দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাতে থাকল লোকগুলো।

'আমার ধারণা, একটা সময় এঅঞ্চলে প্রচুর জলদস্যুর আনাগোনা ছিল,' আবীর বলল।

'হ্যাঁ, ছিল,' ক্যারিবিয়ান সাগরের শান্ত জলরাশির দিকে তাকাল একবার ডিক। 'কয়েকশো বছর আগে দক্ষিণ আর মধ্য আমেরিকায় নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারে মেতে উঠেছিল স্প্যানিশরা। ওদের মূল লক্ষ্য ছিল, দেশগুলোর টন টন সোনা আর রাশি রাশি মূল্যবান পাথর। যা পেত সব লুঠ করত ওরা। বড় বড় গ্যালিয়ন জাহাজ বোঝাই করে নিজের দেশে নিয়ে যেত। জাহাজগুলোর বেশির ভাগকেই পার হতে হতো এঅঞ্চলের সমুদ্রপথ দিয়ে।'

'তারমানে এদিকে জলদস্যুদের আনাগোনাও বেড়ে গিয়েছিল সেকারণেই,' হিপো বলল। 'লোভী স্প্যানিয়ার্ডরা অন্যের সম্পদ লুঠ করত, সেসব আবার ডাকাতি করে নিত জলদস্যুরা। লোভীদের উচিত সাজা!'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' হাসিমুখে বলল ডিক। 'তবে ঝড়ের কবলে পড়লে কারোরই রেহাই মিলত না, সে জলদস্যুই হোক, আর স্প্যানিয়ার্ডই হোক। ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবেছিল মারমেড প্রিন্সেস। লোকে বলে, প্রচুর ধনরত্ন ছিল জলদস্যুদের ওই জাহাজটাতে। যেখানে এখন খুঁজে

বেড়াচ্ছি আমরা।'

'কোনো খোঁজ পেয়েছেন?' জানতে চাইল আবীর।

কাঁধ ঝাঁকাল ডিক। 'হয়তো পেয়েছি। কিংবা পাইনি।'

'এর মানে?' অবাক হলো হিপো।

'মানে হলো, পেলেও সেটা বুঝতে পারিনি। অনেক কথা বললাম। চলি। আবার দেখা হবে।' বলে ডিকের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে গেল টম।

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর হিপো বলল, 'কোথাও পড়েছিলাম, যত সোনা খনি থেকে তুলে এনেছে মানুষ, তার এক তৃতীয়াংশ পড়ে আছে এখন সাগরের তলায়, ডুবে যাওয়া জাহাজের ভিতরে।'

'আচ্ছা, আমরাও গুপ্তধন শিকারী হয়ে গেলে কেমন হয়?' আবীর বলল।

'বললেই তো আর হয়ে গেল না,' জবাব দিল অনিক। 'গুপ্তধন খুঁজে বের করা সহজ কথা নয়। তারচেয়ে স্টক মার্কেটের ব্যবসা করা সহজ।'

'ঠিক বলেছ।'

কথা শুনে ফিরে তাকাল অনিক। একজন বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন। গাঢ় বাদামী চামড়ার রঙ। পরনে বড় বড় ফুল ছাপা কাপড়ের গাউন। 'আপনি কখন এলেন? শুনতে পাইনি তো?'

'হ্যাল্লো, বয়েজ,' ইংরেজিতে বলল মহিলা। কথায় কড়া ক্যারিবিয়ান টান। কণ্ঠস্বরটা বেশ মিষ্টি। 'আমার নাম গোয়েনি। এই দ্বীপে আন্টি গোয়েনিকে চেনে না এমন কেউ নেই। গল্প শুনতে চাও? টাকা দিলেই শুনতে পারবে। বেশি না। মাত্র এক ডলার।'

'কিসের গল্প?' হিপো জিজ্ঞেস করল।

'যা শুনতে চাও,' চওড়া হাসি হাসল মহিলা। বেশ কয়েকটা দাঁত

নেই। 'এ দ্বীপের কোন ঘটনাই আন্টি গোয়েনির কান এড়ায় না। যে কোনো ছোট্ট ঘটনা ঘটলেও চলে আসে আমার কানে। পানির নিচ থেকে গজিয়ে ওঠা পুরানো এই দ্বীপ, বন, পাহাড় আর চারপাশের সমুদ্রের সমস্ত খবর আমার জানা।'

পকেট থেকে একটা ডলার বের করে মহিলার হাতের তালুতে রেখে দিল অনিক। 'জলদস্যুর গল্প শোনা যাক। জানেন নিশ্চয়?'

'কয়টা শুনবে?' টাকাটা গাউনের পকেটে রেখে দিলেন আন্টি গোয়েনি। 'আরাম করে বসো। তারপর শোনো।' বালিতে বসে পড়লেন বৃদ্ধা। সোজা হয়ে বসল ছেলেরা। নাটকীয় ভঙ্গিতে চোখ বুঝলেন মহিলা। যেন কোন গল্পটা বলবেন, মনে মনে বাছাই করছেন।

'হ্যাঁ, শোনো,' আচমকা চোখ মেলে আন্টি গোয়েনি বললেন, 'তিনশো বছর আগে মনিকা নামে একটা মেয়ে বাস করত এই দ্বীপে। ইংল্যান্ড থেকে এসেছিল। এখানে কলার চাষ করত তার বাবা। অনেক কলা ক্ষেতের মালিক ছিল। খুব ধনী লোক ছিল। সব সময় একটা হীরার হার গলায় পরত মনিকা। ওই হারটাই কাল হলো তার।' খুব ভাল করে গুছিয়ে গল্প বলতে পারেন আন্টি গোয়েনি। তাঁর সুরেলা কণ্ঠ যেন মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছে নারকেল পাতার ফিসফিসানি আর ঢেউয়ের মৃদু কলতানের সঙ্গে।

'এক রাতে,' দম নিয়ে আবার শুরু করলেন বৃদ্ধা, 'ঠিক আজকের রাতের মতই সুন্দর ছিল রাতটা। সৈকত ধরে হাঁটছিল মনিকা। এখান থেকে খুব বেশি দূরে না জায়গাটা। হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মনিকার পথ আটকে দাঁড়াল কয়েকজন জলদস্যু। মনিকার গলার হারটা চাইল। কিন্তু হারটা এতই পছন্দের ছিল মনিকার, কোনমতেই দিতে রাজি হলো না সে। ডাকাতগুলোর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। তারপর যা ঘটল,

বলতেও কষ্ট হচ্ছে আমার। এত সুন্দর মেয়েটাকে খুন করল ডাকাতরা।'

'কীভাবে?' গল্প জমে উঠেছে। উত্তেজনায় চকচক করছে আবীরের চোখ।

'কেউ বলে গলা টিপে মারা হয়েছে তাকে,' আন্টি গোয়েনি বললেন। 'কেউ বলে গলা কেটে।'

'হারটা ডাকাতেরা নিয়ে গেছে, তাই না?' অনিক জানতে চাইল।

'তা তো বটেই, ওটার জন্যই তো এত কিছু।' বলার সময় জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালেন আন্টি গোয়েনি। 'তারপর জাহাজে উঠে পাল তুলে দিল ডাকাতেরা। জাহাজ ছেড়ে দিল। কিন্তু কী কাণ্ড! কয়েক ঘণ্টা পর চাঁদের আলোয় এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল তাদের। ঢেউয়ের ওপর দিয়ে কী যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে।' চুপ হয়ে গেলেন আন্টি গোয়েনি।

'কী হেঁটে বেড়াচ্ছিল?' ধৈর্য রাখতে পারছে না হিপো। শোনার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে।

আন্টি গোয়েনিও পরিস্থিতিটাকে টান টান করার জন্যই হঠাৎ চুপ হয়ে গেছেন। এক এক করে ছেলেদের মুখের দিকে তাকালেন তিনি। তারপর জবাব দিলেন, 'মনিকার ভূত!' ফিসফিসিয়ে এমন ভঙ্গিতে কথা বললেন তিনি, যেন আশেপাশেই রয়েছে ভূতটা, শুনে ফেলবে। 'ঢেউয়ের ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছিল মনিকা। মুখটা মোমের মত সাদা। দেখার জন্য ডেকের রেলিঙের কিনারে ছুটে গেল সমস্ত ডাকাত। ভয়ে নিশ্চয় বেহুঁশও হয়ে গিয়েছিল ওদের দু'চারজন। জাহাজ নিয়ে ছুটে পালাল।'

'এরপর আর দেখা গেছে ভূতটাকে?' আবীর জানতে চাইল।

'জানতাম, এ-প্রশ্ন করবে,' আন্টি গোয়েনি বললেন। 'হ্যাঁ, দেখা

গেছে। অনেক নাবিকই দেখেছে ভূতটাকে। চাঁদনি রাতে ঢেউয়ের ওপর হেঁটে বেড়ায়। এখনও খুঁজে বেড়ায় তার প্রিয় হীরার হারটা।'

চুপ হয়ে গেলেন আন্টি গোয়েনি। নীরবতার মাঝে কানে আসছে শুধু বাতাসের কানাকানি আর ঢেউয়ের গুঞ্জন। যেন মনিকার দুঃখে কাতর ওই ঢেউগুলোও।

ফোঁস করে জোরে এক নিঃশ্বাস ফেলল আবীর। 'গল্পটা সাংঘাতিক, আন্টি! সত্যিই দারুণ!'

'তোমার ভাল লেগেছে? খুশি হলাম,' বাউ করার ভঙ্গিতে সামান্য নোয়ালেন আন্টি গোয়েনি। 'আবার যদি কখনও গল্প শুনতে ইচ্ছে করে, আগ্নেয়গিরির ভিতর গিয়ে আন্টি গোয়েনির খোঁজ কোরো। বেশির ভাগ সময় ওখানেই পাবে আমাকে।' উঠে দাঁড়ালেন মহিলা। পোশাক থেকে বালি ঝাড়লেন। তারপর নিঃশব্দ পায়ে সৈকত ধরে এমন করে হেঁটে চললেন, যেন সামুদ্রিক বাণিজ্য বায়ু ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে তাঁকে।

'আগ্নেয়গিরির ভিতরে খুঁজতে বললেন,' অবাক লাগছে অনিকের। 'জ্বালামুখের ভিতরে মানুষ থাকে কী করে?'

'থাকে,' জবাব দিল হিপো। 'শুধু থাকে না, আগ্নেয়গিরির ভিতর দিয়ে হাঁটে, গাড়ি চালায়। জানি বলেই বলছি, নইলে তোদের মতই অবাক হতাম। এখানকার ওই আগ্নেয়গিরিটার নাম লা সোফ্রিয়ার। এখানকার নাম্বার-ওয়ান টুরিস্ট স্পট।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল আবীর, 'তাহলে তো দেখতে যাওয়া দরকার।'

এরপর কয়েকটা মুহূর্ত আর কেউ কোন কথা বলল না। সবাই তাকিয়ে আছে বাঁকা চাঁদটার দিকে। কল্পনার ডানা মেলে দিয়েছে অনিক। একটু আগে আন্টি গোয়েনির মুখে শোনা তিনশো বছর আগের সেই দৃশ্যটা মনের পর্দায় ফুটিয়ে তুলল। তীরে আছড়ে পড়া

ঢেউয়ের শব্দকে এখন কেমন যেন লাগছে।

হঠাৎ পানির কিনারে এমন একটা জিনিস চোখে পড়ল তার, গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল। চোখ বুজল। আবার মেলল। মনে হলো চোখের ভুল। আবার বুজে আবার মেলল। না, চোখের ভুল তো নয়! ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা অতি বাস্তব।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল আবীর।

'ওই দেখ!' ফিসফিস করে বলল অনিক। হাত তুলে দেখাল।

ফিরে তাকাল আবীর। মনে হলো বন্ধ হয়ে যাবে হৃৎপিণ্ডের গতি। মাত্র কয়েক গজ দূরে, সৈকতের পানির কিনারে পড়ে আছে একটা মেয়ের নিথর দেহ।

মোঃ শাওন হোসেন রাজু স স্ক্যান

দুই

স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল অনিক আবীর হিপো। দৌড় দিল মেয়েটার দিকে। সাদা বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে তরুণী মেয়েটা। তার লম্বা চুল ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে।

পানির কাছ থেকে তাকে টেনে সরিয়ে আনল ওরা। হুঁশ ফিরানোর জন্য কয়েকবার তার পিঠে দুই শোল্ডার ব্লেডের ঠিক মাঝখানে চাপড় দিল অনিক।

পিঠে চাপ দিতেই ফোয়ারার মত পানি ছিটকে বেরিয়ে এল মেয়েটার মুখ দিয়ে।

'চিত করে শোয়াও তো,' হিপো আর আবীরকে নির্দেশ দিল অনিক। তিনজনে মিলে চিত করল মেয়েটাকে। চোখ বোজা।

মেয়েটা সুন্দরী। রোদে পোড়া চামড়া। চেহারা দেখা যাওয়াতে বয়েস অনুমান করা গেল। বছর বিশেক হবে।

নাড়ি দেখল অনিক। 'হার্ট চলছে।' তারপর মেয়েটার মাথা সোজা করে, দুই আঙুলে নাক টিপে ধরে, মুখ মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিয়ে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করল।

'সাঁতার কাটতে নেমেছিল বোধহয়,' আবীর বলল। 'জোয়ারে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ঠেলে এনে ডাঙায় ফেলেছে।

'জীপটা নিয়ে এসো,' হিপোকে বলল অনিক। 'হাসপাতালটা কোথায় চেনো নাকি?'

'চিনি,' লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল হিপো।

চুপ করে অনিকের দিকে তাকিয়ে বসে আছে আবীর। সাহায্যের প্রয়োজন হলে করবে। কয়েকবার ফুঁ দিয়ে মুখ সরাল অনিক। মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে তার অবস্থা দেখল। তারপর আবার ফুঁ দেয়া শুরু করল। কয়েকটা উত্তেজিত মিনিট কাটল এভাবে। কোন উন্নতি দেখা গেল না মেয়েটার। বাঁচবে কিনা সন্দেহ হতে লাগল আবীরের।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে দুলে উঠল মেয়েটার বুক। উঁচু হলো। নিচু হলো। আরও খানিকটা নোনা পানি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। খুলে গেল চোখের পাতা।

'হয়ে গেছে, অনিক,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আবীর। 'কাজ হয়ে গেছে!'

'বাঁচা গেল!' অনিক বলল। ফুঁ দিতে দিতে নিজেরও দম ফুরিয়ে এসেছে তার।

একটা পুরানো জীপ গর্জন করে এসে নামল সৈকতে। টায়ারের ঘর্ষায় সাদা বালি ছিটকে উঠল। একেবারে মেয়েটার কিনারে এসে

ব্রেক কষল হিপো। লাফিয়ে নেমে এল ড্রাইভিং সিট থেকে। আবীর আর অনিক ধরাধরি করে জীপের পিছনের সিটে তুলে দিল মেয়েটাকে। আবীর উঠে বসল তার পাশে। একটা কম্বল দিয়ে গা ঢেকে দিল মেয়েটার। সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে উঠল অনিক। হিপো ড্রাইভারের আসনে।

পার্বত্য দ্বীপ। বেশির ভাগটাই পাহাড়-পর্বতে ভরা। ঢালের গায়ে ঘন জঙ্গল। রাস্তার দিকে তীক্ষ্ণ নজর হিপোর। খাড়াই বেয়ে নামছে। কাঁচা রাস্তা। সামান্যতম এদিক ওদিক হলেই গভীর খাদে গিয়ে পড়বে। হেডলাইটের আলোর সীমানা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানটায় গাঢ় অন্ধকার।

জ্ঞান ফিরেছে তরুণীর। কিন্তু ভীষণ দুর্বল। বিড়বিড় করে প্রলাপ বকছে মাঝে মাঝে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে কাত হয়ে পড়ে যেতে পারে, তাই শক্ত করে ধরে রেখেছে আবীর। চোখ খুলছে না মেয়েটা। আবীরের মনে হলো কী যেন বলার চেষ্টা করছে।

'স্কেহ্...!' বিড়বিড় করল মেয়েটা। কণ্ঠস্বর খসখসে।

'থাক, কথা বলার দরকার নেই,' আবীর বলল। 'চুপ করে থাকুন। হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'স্কেহ্...!' আবার বলল মেয়েটা।

'কী?' মেয়েটার প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল আবীর। 'আপনি কি কিছু বলতে চান আমাকে?'

'স্কেহ্...!' আবারও বলল মেয়েটা।

'কী বলতে চায় ও?' ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল সামনে বসা অনিক।

'বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল আবীর। 'শুধু বলছে স্কেহ্।'

'স্কেহ্ বলে বোধহয় "স্কেয়ার" বোঝাতে চাচ্ছে।' গীয়ার বদল

করল হিপো। ওপরের দিকে উঠছে এখন। 'তারমানে ভয় পাচ্ছে বলতে চায়।'

'হতে পারে,' জবাব দিল আবীর।

ওদিকে আবার চোখ বুজল মেয়েটা।

শীঘ্রি সোফ্রিয়ার গাঁয়ে পৌঁছল ওরা। একটা দোতলা বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল হিপো। এটাই হাসপাতাল। তিনজনে মিলে তরুণীকে বয়ে নিয়ে এল ওয়েইটিং রুমের ভিতরে। একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। ডেস্কে বসা নার্সের দিকে এগোল অনিক।

'কি হয়েছে ওর?' নার্স জানতে চাইল।

'জানি না,' জবাব দিল অনিক। 'সৈকতে পড়ে ছিল। পেট থেকে প্রচুর নোনা পানি বেরিয়েছে। ডুবতে ডুবতে বেঁচেছে মনে হয়।'

'ওর পরিচয় জানো?' মেয়েটার দিকে একটা হুইলচেয়ার ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করল নার্স।

'না।'

'ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। জ্ঞান ফিরে আসুক। ওর মুখ থেকেই সব শোনা যাবে।'

মেয়েটাকে হুইলচেয়ারে তুলে দিল তিন গোয়েন্দা। হলওয়ে ধরে হুইলচেয়ার ঠেলে নিয়ে চলল নার্স।

তিন গোয়েন্দা অপেক্ষা করতে লাগল। বিশ মিনিট পর ওয়েইটিং রুমে ঢুকলেন সাদা অ্যাপ্রন পরা একজন ডাক্তার। 'ভাগ্যিস একেবারে সময়মত আনতে পেরেছিলে। পাম্প করে পেট থেকে প্রচুর পানি বের করতে হয়েছে। এখন একটা লম্বা ঘুম দরকার ওর। মেয়েটার পরিচয় জানতে পারলে ভাল হতো। ওর বাবা-মা বা কোন আত্মীয়-স্বজন থেকে থাকলে খবর দিতে পারতাম।'

'ও নিজে কিছু বলেনি?' অনিক জিজ্ঞেস করল।

'অনেক চেষ্টা করেছি। কোন কথাই বের করা গেল না ওর মুখ থেকে। অবাকই লাগছে আমার। বলতে পারছে না, না বলতে চাইছে না, ঠিক বুঝলাম না।'

'আমরা একবার দেখা করতে পারি? আমাদের কাছে হয়তো বলবে।'

'কী জানি!' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন ডাক্তার। 'আঠারো নম্বর রুমে আছে। যাও। চেষ্টা করে দেখো। তবে বলানোর জন্য বেশি চাপাচাপি কোরো না।'

'না, করব না,' বলে দুই সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দা ধরে এগোল অনিক। আঠারো নম্বর রুমের দরজায় এসে টোকা দিল। আস্তে করে ঠেলা দিল পাল্লায়। ভিতরে ঢুকল। তাকে অনুসরণ করল হিপো ও আবীর। ঘরের আলো নিভানো। তবে বারান্দার আলো ঘরে ঢুকছে। সেই আলোতে মেয়েটাকে দেখা গেল। বিছানায় শোওয়া।

বিছানার দিকে এগোল অনিক। মেয়েটার চোখ খোলা। পরনে হাসপাতালের গাউন। কব্জিতে বাঁধা আই-ডি ব্রেসলেট, হাসপাতালের পরিচয়পত্র। বাদামী রঙের লম্বা চুলগুলো এখনও ভিজা। বালিশে ছড়িয়ে আছে। চেহারাটা আন্তরিক। কিন্তু নীল চোখের তারায় ভয়ের ছায়া।

'কেমন লাগছে?' জানতে চাইল অনিক।

'ভালই,' জবাব দিল মেয়েটা। কণ্ঠস্বর এখনও খসখসে। 'তোমরাই আমাকে এখানে এনেছ, তাই না?'

'হ্যাঁ। আমি অনিক। ওরা আমার বন্ধু। ও হিপো। আর ও আবীর। আপনার নাম কী?'

'নাম?' দীর্ঘ একটা মুহূর্ত দ্বিধা করল তরুণী। তারপর বলল, 'নাম...কারিনা।'

'শুধুই কারিনা?'

'বাকিটা শোনার কি আর দরকার আছে?'

'এখানে আপনার কে কে আছেন? বাবা, মা, পরিবার?'

'না,' প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল কারিনা। 'আমার একটা উপকার করবে?'

'নিশ্চয়ই। বলুন?'

'আমাকে এখানে আনা হয়েছে, এই হাসপাতালে আছি, কাউকে বোলো না। প্লিজ। কথা দাও?'

'ঠিক আছে, বলব না।' অবাক লাগছে অনিকের। রহস্যময় লাগল তার কাছে ব্যাপারটা।

'কি হয়েছিল আপনার, সেটা বলতে নিশ্চয় আপত্তি নেই?' হিপো জিজ্ঞেস করল।

'না,' মাথা নাড়ল কারিনা। 'তবে পরিষ্কারভাবে সব মনে করতে পারছি না। শুধু মনে আছে...ধস্তাধস্তি...তারপর...'

'তারপর কী?'

'মনে করতে পারছি না,' কারিনা বলল। ভুরু কুঁচকে ফেলেছে। যেন হারানো কথাগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে স্মৃতির পাতায়। 'কেউ আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল...তারপর দেখি পানিতে...তারপর...তারপর দেখি সাঁতরাচ্ছি...অনেকক্ষণ ধরে সাঁতরালাম...তারপর অবশ হয়ে এল হাত-পা...আর পারলাম না...এরপর দেখি এখানে!'

'কারিনা?' বিছানার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল আবীর।

আবীরের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মেয়েটা। 'বলো?'

'জীপে করে আপনাকে আনা হয়েছে এখানে। আমি আপনার পাশে বসা ছিলাম। বার বার একটা অদ্ভুত শব্দ বলেছেন। স্কেহ্।

মানে কী এর?'

'আবীরের দিকে তাকিয়ে রইল কারিনা। মুখে চিন্তার ছাপ। যেন তথ্যটা ফাঁস করা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছে না। অবশেষে জবাব দিল, 'জানি না।'

কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে অনিক বলল, 'থাক, আর বিরক্ত করব না এখন। ঘুমান। কাল সকালে আবার দেখতে আসব। চলি। গুড নাইট।'

'গুড নাইট,' ফিসফিস করে জবাব দিল কারিনা। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাদের। আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্য।'

*

সাপের মত এঁকেবেঁকে পড়ে থাকা কালো রাস্তাটা ধরে জীপ চালিয়ে ফিরে চলেছে আবার হিপো। পাশে বসা অনিক। পিছনে আবীর। দ্বীপের বেশির ভাগ রাস্তাই খারাপ। পাহাড় বেয়ে কখনও ওপরে উঠে গেছে, কখনও ঢাল বেয়ে নেমেছে। সোজা, সমতল রাস্তা প্রায় নেই বললেই চলে।

'শিওর, তথ্য জানাতে ভয় পাচ্ছে কারিনা,' একটা পথের বাঁকে জীপের গতি কমাল হিপো। 'আমার মনে হয়, যে লোকটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেছিল, তাকে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' পিছন থেকে সমর্থন করল তাকে আবীর। 'আর সেকারণেই পুরো নামটা বলেনি। সেকারণেই তাকে খুঁজে পাওয়ার কথাটা কাউকে না জানাতে বার বার অনুরোধ করেছে আমাদের। আর কণ্ঠস্বর যে খসখসে হয়ে গেছে, তার কারণ ক্রমাগত চিৎকার। অনেক চেঁচামেচি করেছে। অদ্ভুত কোন কিছু ঘটছে এ-দ্বীপে, অনিক।'

'কী, বলেছিলাম না?' অন্ধকারে ভুরু নাচাল হিপো। 'অনিক হলো

গোলমাল আকর্ষণের চুম্বক। আমরা গোলমালে জড়াতে না চাইলেও গোলমাল নিজে থেকে এসেই হাজির।'

'হোক হাজির,' সামনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল অনিক। 'আমরা জড়াব না, তাহলেই হলো।'

'পারবি না। কারণ, শুধু গোলমাল না, এর সঙ্গে রহস্যও জড়িত।

'হুঁ!' মাথা দোলাল অনিক। কী যেন ভাবল। 'যা বুঝলাম, ডুবে মরতে মরতে অল্পের জন্য বেঁচে গেছে মেয়েটা। প্রচণ্ড শক পেয়েছে। হয়তো ভুলভাল বকছে সেকারণেই। যা ঘটেছে, তার বেশির ভাগই মনে করতে পারছে না। সকালে হয়তো পারবে।'

'হয়তো...!' কথাটা শেষ হলো না হিপোর। গর্তে পড়ল জীপের চাকা। প্রচণ্ড ঝাঁকি সামলাতে গিয়ে কথা বন্ধ হয়ে গেল তার।

*

পরদিন সকালে কাঠের তৈরি বাংলো বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। হিপোর চাচার বাড়ি। বাংলোর চারপাশ ঘিরে মনোরম বন। নানারকম গাছ। সেগুলোতে রোদ পড়েছে। হালকা বাতাসে দুলছে ঘন সবুজ পাতা। ডালে ডালে পাখির কলতান। ডাক শুনে মনে হয় সঙ্গীত পরিবেশন করছে। বাতাস মিষ্টি। তাজা। স্বর্গ মনে হচ্ছে জায়গাটাকে।

'আহ্, কী সুন্দর দিন!' মুগ্ধকণ্ঠে বলল অনিক। 'ছুটি কাটানোর জন্য দারুণ!'

'ঠিক বলেছিস,' আবীরও একমত।

বাংলোর পাশে একটা নৌকা পড়ে আছে। বহু পুরানো। তলায় চির ধরেছে। জোড়াগুলোরও ফাঁক বেড়ে গেছে। পুরু করে আলকাতরা মাখিয়ে বন্ধ করা হয়েছে সেগুলো, যাতে পানি চোয়াতে না পারে। পিছন দিকে বসানো একটা আউটবোর্ড মোটর।

'দেখে আহামরি কিছু লাগে না,' হিপো বলল। 'তবে আমার চাচা বলেছে, সাগরে চালানোর উপযুক্ত আছে এখনও। সামনের ঘরে একটা আলমারিতে বোট নিয়ে সাগরে বেরোনোর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রয়েছে। যখন খুশি বের করে নেয়ার ঢালাও অনুমতি দিয়ে গেছে।'

হিপোর চাচা আপাতত সেইন্ট লুসিয়ায় নেই। পুরো মাসটাই থাকবেন না। ব্যবসার কাজে বেরিয়েছেন। হিপোকে অনুরোধ করে গেছেন, তাঁর একজন ব্যবসায়ী বন্ধুকে প্লেনে করে যেন আশেপাশের কয়েকটা দ্বীপে নিয়ে যায়। ব্যবসার কাজেই দ্বীপগুলোতে ঘুরবেন ভদ্রলোক।

প্লেন ভালই চালাতে পারে হিপো। ওর চাচার নিয়মিত পাইলটদের একজন ছুটিতে থাকায় পাইলটের দায়িত্বটা আপাতত ওকেই পালন করার অনুরোধ করে গেছেন তিনি।

'আমার শেষ ঠিকানা মারটিনিক দ্বীপ,' হিপো বলল। 'বেলা চারটে নাগাদ পৌঁছে যাব ওখানে। ছ'টার আগেই ফিরে আসব। সন্ধ্যায় দেখা হবে তোদের সঙ্গে। কারিনার কাছ থেকে কী জেনেছিস, শুনব তখন।'

'যদি ও বলে আমাদেরকে,' অনিক বলল। 'যা। সাবধানে চালাস। দুর্ঘটনা ঘটিয়ে আমাদের ছুটিটা মাটি করিসনে আবার।'

'না, তা করতে যাব না। তোদের ছুটি মাটি করার চেয়েও আমার জীবন আমার কাছে অনেক বেশি প্রিয়।' হেসে জবাব দিল হিপো। জীপে করে চলে গেল।

আবীরের দিকে ফিরল অনিক। 'ন'টার আগে কারিনার সঙ্গে দেখা করা যাবে না। এক কাজ করি চল। বসে না থেকে বন্দরের দিকটা থেকে একটু ঘুরে আসি।'

'চল।'

বাংলো থেকে সৈকত বেশি দূরে না। হেঁটেই চলে এল। সৈকতের বালি মাড়িয়ে এগিয়ে গেল মাইলখানেক। ইতিমধ্যেই রৌদ্রস্নান করতে চলে এসেছে কয়েকজন টুরিস্ট। খোলা গায়ে রোদ লাগাচ্ছে।

সাগরের পানি আকাশ-নীল। রোদে ঝলমল করছে। তার কিনারে ধবধবে সাদা বালির সৈকত। রূপ বটে! এই রূপের সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। যে না দেখেছে, বোঝানো যাবে না।

বুক ভরে তাজা নোনা বাতাস টেনে নিয়ে আবীর বলল, 'যে কোন অকারণে রোগ সেরে যাবে এখানে এলে। ডাক্তাররা তো আর খামাখা সাগরতীরে চেঞ্জে যেতে বলেন না।'

বালি মাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে তাকাল অনিক। সৈকতের কিনার ঘেঁষে গজিয়ে উঠেছে নারকেলের সারি।

বন্দরে পৌঁছল দুই গোয়েন্দা। নোঙর করা অসংখ্য ছোটবড় জলযান ভাসছে পানিতে। ইয়ট, ইঞ্জিনবোট, পালতোলা নৌকা, মাছধরা ট্রলার, কোনটারই অভাব নেই। কিছু কিছু বোট ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে গেছে খোলা সাগরের দিকে। বেশির ভাগ দামী বোট আর ইয়টের মালিক টুরিস্টরা। দ্বীপেও ধনী লোক আছে। তাদেরও কেউ কেউ দামী বোট কিংবা জাহাজের মালিক।

ডকের এক জায়গায় সাত-আটজন লোককে জটলা করতে দেখা গেল। টম আর ডিকও রয়েছে তাদের মাঝে। খাটো প্যান্ট আর টি-শার্ট পরেছে প্রায় সবাই, দু'একজনের পরনে শুধু বাদিং সুট।

'লোকগুলো কে?' আবীরের প্রশ্ন। 'মারমেড প্রিন্সেসকে খুঁজতে আসা দলটা না তো?'

এগিয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা কানে এল। ঝগড়া করছে দুজন লোক।

'মারামারি বাধাবে না তো?' শঙ্কিত হলো অনিক।

তার আশঙ্কাটা অমূলক নয়। বাকবিতণ্ডাটা খুব দ্রুত চেঁচামেচিতে রূপ নিল। যে দুজন ঝগড়া করছে, তাদের একজনের হালকা-পাতলা শরীর, বেজির মত লম্বাটে মুখ। অন্যজন বিশালদেহী, রীতিমত একটা ভালুক।

'আমি ওকথা বলিনি!' চেঁচিয়ে উঠল বেজিমুখো লোকটা।

'নিশ্চয় বলেছ!' গর্জন করে উঠল ভালুকদেহী লোকটা।

এক পা আগে বাড়ল সে। ঘাবড়ে গেল পাতলা লোকটা। আর তর্ক না করে ঘুরেই দৌড়। ছুটে আসতে লাগল গোয়েন্দাদের দিকে। ভালুকদেহী তাড়া করল ওকে। শরীরটা বিশাল হলেও ছুটতে পারে অসম্ভব দ্রুত। দৌড়ে এসে বেজিমুখোর হাত চেপে ধরল।

'শোনো, ব্রডি, আজ আর তোমাকে ছাড়ছি না আমি!' চিৎকার করে বলল ভালুক।

'কিন্তু বিশ্বাস করো, মরগান, তোমার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিনি আমি!' কুঁই কুঁই করে উঠল বেজিমুখো রোগাটে লোকটা।

বিশাল থাবা উঁচু করল মরগান। রোমশ বাহু। মুঠো হয়ে এল রোমশ আঙুলগুলো। ঘুসি মেরে ভর্তা বানিয়ে ফেলবে ব্রডি বেচারাকে।

মোঃ শাওন হোসেন রাজু স স্ক্যান

তিন

মাথার ভিতরে কী জানি কী ঘটে গেল আবীরের। ফুটবল মাঠে মাঝে-মধ্যে এরকম হয় তার। হেরে যাবার সম্ভাবনা দেখলে। বল নিয়ে

তখন প্রতিপক্ষের ওপর চড়াও হয়। মাথা নিচু করে সোজা ছুটে গেল বিশালদেহী লোকটার পেট লক্ষ্য করে। ভয়ঙ্কর গুঁতো মারল মাথা দিয়ে। বালির ওপর চিত হয়ে পড়ে গেল লোকটা। আবীর তার ওপরে।

'এই, কী করছ!' গর্জে উঠল মরগান।

পরক্ষণে আবীর দেখল, সে নিজেই এখন বালিতে চিত, মুহূর্তে তাকে উল্টে ফেলে তার বুকে চেপে বসে আছে বিশালদেহী ভালুকের মত লোকটা। ঘুসি তুলল মারার জন্য।

নড়ে উঠল অনিক। বিদ্যুৎ খেলে গেল শরীরে। শেষ মুহূর্তে কব্জি চেপে ধরে ঘুসিটা আটকাল, আবীরের মুখে লাগার আগেই।

ইতিমধ্যে নড়ে উঠল বাকি সবাই। হুড়াহুড়ি করে এগিয়ে এল চারপাশ থেকে। 'থামো, মরগান! শান্ত হও! মেজাজ ঠাণ্ডা করো!' হাত চেপে ধরে ওকে আবীরের ওপর থেকে নামিয়ে আনল বাদামী-চুল লোকটা, যার নাম টম।

হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল দুজনেই–মরগান ও আবীর। কালো কোঁকড়া চুল থেকে বালি ঝেড়ে ফেলতে শুরু করল মরগান। ওর দিকে কড়া নজর রেখে কুঁচকানো পোশাক টেনেটুনে ঠিক করতে লাগল আবীর। মরগানের বয়েস তিরিশের কোঠায়। বিশালদেহী আর ভালুকের লোম বাদ দিলে চেহারাটা খারাপ না। ডান হাতের ইয়া মোটা পেশিবহুল বাহুতে উল্কি দিয়ে একটা নোঙরের ছবি আঁকা। দ্রুত মরগানের রাগ কমে যেতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আবীর।

'ওই হাঁদাটার জন্য দুঃখ হচ্ছে এখন আমার,' বেজিমুখো লোকটাকে দেখিয়ে মরগান বলল। একটা হাত বাড়িয়ে দিল আবীরের দিকে। 'মাঝে মাঝে মেজাজ খুব খারাপ হয়ে যায়। কোনভাবেই ঠিক রাখতে পারি না। বাধা দিয়ে যে আমাকে ঠেকালে, সেজন্য ধন্যবাদ।

আমার নাম রিগ মরগান।'

'হাই, রিগ,' আমেরিকান কায়দায় নাম ধরে বলে আন্তরিকতা প্রকাশ করল আবীর। হাতটা বাড়িয়ে দিল মরগানের দিকে। নিজেদের পরিচয় দিল।

মরগানের বিশাল ভালুক থাবার ভিতরে আবীরের হাতটা হারিয়ে গেল। ভীষণ শক্তি লোকটার গায়ে। হাসিমুখে বলল, 'সাহস আছে তোমার, খোকা, স্বীকার করতেই হচ্ছে।' তারপর আবীরের হাত ছেড়ে দিয়ে সরে গেল নিজের দলের কাছে।

'আবার দেখা হবে,' আবীরকে বলল ডিক।

ডিকের দিকে তাকাল অনিক। জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, কী হচ্ছিল এখানে, বলুন তো?'

'আমরা সবাই আন্ডারওয়াটার স্যালভিজ অপারেশনের লোক,' ডিক জানাল। 'সংক্ষেপে ইউ-এস-ও। পানির নিচের হারানো জিনিস খুঁজে বের করে উদ্ধার করা আমাদের কাজ। কাজটা ভীষণ একঘেয়ে আর কঠিন। একঘেয়েমি আর নানারকম সমস্যার কারণে সব সময় মেজাজ ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই মাঝে মাঝেই পরিস্থিতি এরকম খারাপ হয়ে যায়। পরে আবার ঠিকও হয়ে যায়।'

'আজকের সমস্যাটা কী?' জানতে চাইল অনিক।

'আজকের সমস্যা, আমাদের একজন মহিলা-কর্মচারী। ওর নাম কারিনা। কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি। আজ সকালেও তার খবর নেই। বুঝে উঠতে পারছি না, ওকে ফেলেই কাজে চলে যাব, নাকি কাজ ফেলে ওকে খুঁজতে বেরোব।'

'নামটা কি বললেন? কারিনা?' ভুরু কুঁচকাল আবীর।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ডিক, 'কারিনা অ্যান্ডারসন। কেন, চেনো নাকি?'

'আমি চিনব কীভাবে?' ঘুরিয়ে জবাব দিল আবীর। সরাসরি মিথ্যেও বলা হলো না, আবার কারিনাকে যে কথা দিয়ে এসেছে কাউকে বলবে না তার খবর, সেই কথাটাও রক্ষা করা হলো।

'আমারও তাই ধারণা, তুমি আর চিনবে কীভাবে?' ডিক বলল। 'আমেরিকা থেকে এসেছে মেয়েটা। আমেরিকার ভারজিনিয়া থেকে। আমাদের জাহাজের লোকজন রাদে দ্বীপের আর কাউকে চেনে না সে। চিনলেও আমরা জানি না। ভীষণ শক্ত মেয়ে। নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা ওর আছে। সহজে কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না ওর। কিন্তু তারপরেও উদ্বেগ কাটাতে পারছি না। দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না।'

আবারও তর্ক শুনে ফিরে তাকাল আবীর। আরেকটা ঝগড়া শুরু হতে যাচ্ছে। এদলেরই অন্য দুজন লোকের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় শুরু হয়ে গেছে।

তাদের একজন লম্বা। কালো ঢেউ খেলানো চুল। খাড়া, ধারাল নাক। বয়েস চল্লিশের কোঠায়। পরনে অভিজাত ছাঁটের দামী পোশাক। চোখে সানগ্লাস। আঙুলে পাথর বসানো আঙটি। হাত নাড়লেই ঝিক করে ওঠে। কথায় কড়া ফরাসী টান।

'উনি কে?' জানতে চাইল আবীর।

'ম্যাসন মোঁপা,' ডিক জানাল। 'কলার ব্যবসা আছে তাঁর এদ্বীপে। কলাক্ষেতের মালিক। আমাদের গুপ্তধন শিকারের খরচ বহন করছেন যাঁরা, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কারিনাকে শেষ দেখেছেন তিনিই। তাঁর অফিসে হিসাব রক্ষকের কাজ করে মেয়েটা। কাল রাতেও কাজ করে দিয়ে এসেছিল।'

চট করে পরস্পরের দিকে তাকাল অনিক-আবীর।

'অন্য লোকটা কে?' ডিকের কাছে জানতে চাইল অনিক।

'ইমবেলিক জনসন,' ডিক জানাল। 'জাহাজের ক্যাপ্টেন।

আমাদের এই অভিযানের নেতা।'

জনসনের চেহারা দেখেই বোঝা যায়, জীবনের বেশির ভাগটাই সাগরে সাগরে কাটিয়েছেন। রোদেপোড়া চামড়ায় ভাঁজ। ধূসর চুল। গলায় ঝোলানো একটা চেন। তাতে চকচকে সোনার তৈরি মোহরের একটা লকেট। বয়েস ষাটের কোঠায়। কিন্তু দেখে অনুমান করা কঠিন, আসল বয়েস কত।

'না!' দৃঢ়কণ্ঠে জনসনকে বললেন ম্যাসন। 'কাজ মিস করা উচিত হবে না। সময়ের এখন খুব দাম। নষ্ট করা সম্ভব না।'

'কিন্তু মেয়েটা যদি বিপদে পড়ে থাকে? তাঁকে উদ্ধার করে আনা আমাদের দায়িত্ব,' জনসন বললেন ভারি কণ্ঠে। 'অন্তত দুজন লোককে তো শহরে পাঠাতে পারি ওকে খোঁজার জন্য?'

'দুজন বাড়তি লোক এখন পাব কোথায়?' ভুরু নাচালেন ম্যাসন।

অনিকের একবার মনে হলো, বলে দেয় কারিনা কোথায় আছে। কিন্তু কারিনাকে কথা দিয়ে এসেছে, ওর খবর কারও কাছে বলবে না, তাই চেপে গেল। বরং জানা দরকার, কেন ওদের কাছ থেকে লুকিয়ে আছে মেয়েটা।

'শুনুন,' সামনে এগিয়ে গেল অনিক। ম্যাসন আর জনসনের উদ্দেশ্যে বলল, 'যদি বলেন তো আমরা আপনাদের কাজটা করে দিতে পারি। আমি আর আমার এই বন্ধু।' আবীরের কাঁধে হাত রাখল সে।

ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন জনসন, 'তোমরা কে?'

'গোয়েন্দা,' জবাবটা ডিক দিল। 'শখের।' এগিয়ে এল সে। 'কাল রাতে ওদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার আর টমের। ওদের বাড়ি বাংলাদেশে। আমেরিকায় থেকে পড়াশোনা করে। এইমাত্র মরগানকে বাধা দিয়ে ব্রডিকে বাঁচাল। নইলে ব্রডিকে আজ ভর্তা না

বানিয়ে ছাড়ত না মরগান।'

রুক্ষকণ্ঠে মরগান বলল, 'পিটান না দিয়ে উপায় ছিল না। ইদানীং আমাদের কর্মীরা সবাই কেমন বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে। এত ভাল লোক ছিল সবাই। কিন্তু এখন কেমন বদলে যাচ্ছে। লোভী। সন্দিহান। অবিশ্বস্ত। জানি, গুপ্তধনের গন্ধ পেলে হয় এরকম। ওদের বেলায়ও এটাই হচ্ছে কিনা কে জানে।'

'তারমানে জলদস্যুর জাহাজটা খুঁজে পেয়েছেন আপনারা?'

কায়দা করে প্রশ্নটা করল আবীর। আশা করল, সত্যিকারের জবাবটা পাবে জনসনের কাছ থেকে। ডিকের মত চেপে যাবেন না।

'হ্যাঁ, পেয়েছি,' অস্বীকার করলেন না কিংবা এড়িয়ে গেলেন না জনসন। 'দুই হপ্তা আগে। স্কেলিটন রীফের কাছে। আমার লোকদের কড়া হুকুম দিয়ে দিয়েছিলাম, কাউকে যেন না বলে। কিন্তু ওরা না বললে কী হবে, গুপ্তধনের গন্ধ যেন বাতাসে ছড়ায়। কৌতূহলী লোকের তো আর অভাব নেই। বোটে করে দ্বীপের লোকেরা আসে, কী করছি জানতে চায়। যতই গোপন রাখার চেষ্টা করি, ততই যেন আরও ফাঁস হয়ে যায়। দ্বীপের অর্ধেক লোকই এখন জানে, জাহাজটা আমরা পেয়ে গেছি, গুপ্তধন তুলতে শুরু করে দিয়েছি।'

'তাই?' অনিক বলল।

'হ্যাঁ,' জনসন বললেন। 'তোমাদের কাছে কোন কথা গোপন করলাম না। এখন বলো, তোমরা আমাদের কী সাহায্য করতে পারবে?'

'আমরা দুজন,' অনিক বলল, 'শহরে ঘুরে ঘুরে খোঁজ নিতে পারি। কারিনা অ্যান্ডারসনকে কেউ দেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করতে পারি। থানায় আর হাসপাতালগুলোতেও খোঁজ নিতে পারি। একাজের ভার নিশ্চিন্তে আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে আপনারা

আপনাদের কাজে চলে যান। তাতে আপনাদেরও কাজের ক্ষতি হবে না, কারিনাকে খোঁজার কাজটাও হয়ে যাবে।'

'যদি পারো, তাহলে তো খুবই ভাল হয়,' অনিক-আবীরের দিকে তাকালেন জনসন। 'মোবাইল ফোন আছে তোমাদের কাছে?'

'না,' অনিক বলল।

'আমার মোবাইল নম্বরটা লিখে নাও। কারিনার খোঁজ নেয়া হয়ে গেলে আমাকে জানিও। কোনো দোকান থেকে ফোন করে দিও। দোকানদারকে বোলো, বিলটা আমিই দেব। কারিনার ব্যাপারে আমার একটা দায়িত্ব আছে। ওর খবর আমার জানা দরকার।' মানিব্যাগ থেকে একটুকরো কুঁচকানো কাগজ বের করে নম্বরটা লিখে দিলেন জনসন।

'চিন্তা করবেন না,' অনিক বলল। 'আমরা জানার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জানাব।'

'না, চিন্তা করব না।' মাথার ক্যাপের কানাটা টেনে নামিয়ে আবার ওপরে তুলে দিলেন জনসন। অস্থিরতার লক্ষণ। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাদের।'

একটা মুহূর্তও আর দেরি না করে দলবল নিয়ে ডকের দিকে রওনা হলেন তিনি।

দলটা দূরে সরে গেলে আবীর বলল, 'নাক গলানোর ভাল একটা বুদ্ধি বের করলি, অনিক। কারিনার সঙ্গে দেখা করাটা এখন আমাদের জন্য সহজ হয়ে গেল। চল, ওকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, ওর খবর জনসনকে জানাব কিনা।'

ডক থেকে কিছুটা দূরে সৈকতে তুলে রাখা নৌকা পানিতে নামাচ্ছে কয়েকজন জেলে। কাঠের তৈরি স্কিফ নৌকা। লম্বা, হালকা। ছিপ নৌকার মত। বৈঠা বেয়ে চালায়। ইঞ্জিন নেই এসব

নৌকার। মাছ ধরার সরঞ্জাম বলতে জেলেদের আছে শুধু বড় বড় জাল। বেশির ভাগ জেলেই শার্ট খুলে খালি গায়ে কাজ করছে। পায়ে জুতোও নেই।

'আরে, কী করছ, মান?' চেঁচিয়ে উঠল একজন জেলে। 'আস্তে টানো না। তলাটা খসিয়ে ফেলবে নাকি?'

'আস্তেই তো টানছি, মান,' জবাব দিল আরেকজন জেলে।

'ডকের কাছে যে সব মাছধরা বোট দেখেছি, ওগুলোতে ইঞ্জিন আছে,' আবীর বলল অনিককে। সৈকতের জেলেদের কথা বলল, 'কিন্তু ওদের নৌকাগুলো একেবারে আদিম। মনে হয় সেই কলম্বাসের আমল থেকেই এই নৌকা দিয়ে মাছ ধরে আসছে ওরা।'

'সাধে কী আর ধরে,' জবাব দিল অনিক। 'নিশ্চয় এতই গরীব, ইঞ্জিন কেনার টাকাও নেই।'

কথা বলতে বলতে ফিরে তাকাল অনিক। চোখ জুড়ানো দৃশ্য। যেদিকে যতদূর চোখ যায়, দ্বীপের ভিতরে ঘন সবুজ গাছপালা। উজ্জ্বল রঙের ফুল ফুটে আছে ঝোপে, ঝাড়ে। দ্বীপের দুই পাশে দুটো পর্বত দেখা যাচ্ছে। চোঙার মত চূড়া। যেন দ্বীপের অনন্ত প্রহরার কাছে ব্যস্ত, অনুপ্রবেশকারীরা যাতে ঢুকতে না পারে। পর্বতের ঢালের গায়ে ঘন হয়ে গাছ জন্মেছে। দূর থেকে মনে হয় সবুজ কার্পেটে ঢাকা।

'ওগুলোর নাম পিটন,' আবীর বলল। 'কোটি কোটি বছর আগে ওগুলোর জন্ম, অগ্ন্যুৎপাতের ফলে।'

'তুই জানলি কী করে?'

'বই পড়ে। সাগরের দিক থেকে নাকি সাংঘাতিক লাগে দেখতে, দারুণ দৃশ্য।'

'তা তো হবেই,' অনিক জবাব দিল। 'এখান থেকেই যা

লাগছে।'

সৈকত ধরে মাইলখানেক হেঁটে এল দুজনে। সোফ্রিয়ার ভিলেজে পৌঁছল। শহরের কেন্দ্রস্থল এটা। দেখে মনে হয় না গত একশো বছরে এর কোনরকম পরিবর্তন হয়েছে। বেশির ভাগ দোকানপাট আর অফিস তৈরি হয়েছে লম্বা ফালি করে কাটা তক্তা দিয়ে। এমন করে একটার ওপর আরেকটা তক্তা সাজিয়ে বসানো, বৃষ্টির পানি অনায়াসে বেয়ে নেমে যায়, ঘরের ভিতর চোয়ায় না।

রাস্তায় লোকের ভিড়। গাঁয়ের লোক আছে, প্রচুর টুরিস্টও আছে। বেতের ঝুঁড়ি মাথায় নিয়ে বাজার করতে এসেছে গাঁয়ের মহিলারা। ওদের হাসিমুখ আর আচরণে মনে হচ্ছে সবাই সুখী। কারও মনে কোন দুঃখ নেই। সার্বক্ষণিক একটা ছুটি ছুটি পরিবেশ। দেখে ভাল লাগল আবীরের।

বহু পুরানো একটা বাস ছুটে এল যেন খেপার মত। ভেঁপু বাজাতে বাজাতে ছুটে গেল রাস্তা ধরে। উচ্চনাদে ক্যালিপসো মিউজিকের শব্দ আসছে বাসের রেডিও থেকে।

আবীরের দিকে তাকিয়ে হেসে ভুরু নাচাল অনিক। 'কী বুঝলি?' মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে বাসটার দিকে দেখিয়ে বলল, 'মিউজিক বাস নাম দেয়া যায়, কি বলিস? বাংলায়, বাজনা বাজানো বাস।'

'আমার কিন্তু ভালই লাগছে, মান,' দ্বীপবাসীদের মত করে বলল আবীর।

হাসল অনিক, 'দ্রুত শিখে ফেলছিস দেখি!'

হাসল আবীর।

একটা খোলা বাজারে ঢুকল দুজনে। বাজারের যে অংশে ফল বিক্রি হয়, সেখানে চলে এল। ঝুড়িতে করে প্রচুর তাজা ফল সাজিয়ে নিয়ে বসেছে দোকানীরা। কলা, আম, নারিকেল, আনারস, ব্রেডফ্রুট,

তরমুজ ভর্তি ঝুড়িগুলো রেখেছে লম্বা লম্বা টেবিলে। আমের আকার দেখে দুই গোয়েন্দা অবাক। ফজলি আমের চেয়ে বড় একেকটা আম। দুটো আম কিনল ওরা। চামড়া ছিলে কামড় বসাতেই কশা বেয়ে রস গড়াতে লাগল।

'কী মিষ্টি রে!' আবীর বলল। 'আর যা বড়। এক আম দিয়েই তো সকালের নাস্তা শেষ।'

ঘড়ি দেখল অনিক। 'ন'টা কিন্তু বাজে। কারিনার ওখানে যাওয়ার সময় হয়েছে।'

হাসপাতালে পৌঁছে ডেস্কে নতুন নার্সকে দেখতে পেল ওরা। আগের রাতের নার্স ডিউটিতে নেই। কারিনার কথা জিজ্ঞেস করল অনিক। নার্স জানাল, ঘণ্টাখানেক আগে দেখে এসেছে। কারিনা ঘুমাচ্ছে। ভালই আছে।

নার্সের অনুমতি নিয়ে তাকে দেখতে চলল দুজনে। বারান্দা ধরে এগোল।

আঠারো নম্বর রুমের সামনে এসে দাঁড়াল। বন্ধ পাল্লায় টোকা দিল অনিক। সাড়া নেই। জোরে জোরে থাবা দিয়েও যখন জবাব পেল না, আস্তে করে পাল্লা ঠেলে ফাঁক করে ভিতরে উঁকি দিল সে। জানালার সাদা পর্দা ভেদ করে রোদের আলো এসে পড়ছে ঘরে। বিছানায় গুটিসুটি হয়ে পড়ে আছে কারিনা। মুখ, হাত, পা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সব চাদরে ঢাকা।

পাল্লাটা পুরো খুলল অনিক।

আস্তে ডাক দিল আবীর, 'কারিনা!' জবাব না পেয়ে স্বর আরেকটু উঁচু করে ডাকল, 'মিস কারিনা!'

জবাব নেই।

ঘরে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। কারিনার বিছানার পাশে এসে

দাঁড়াল। ছোঁয়ার জন্য হাত বাড়িয়েও হাতটা সরিয়ে নিল আবীর। অস্বস্তি লাগছে। আবার হাত বাড়াল। যেখানে মাথাটা থাকার কথা, সেখানে হাত রাখল। নরম লাগল। মানুষের মাথা এরকম নয় মোটেও।

সন্দেহ হলো আবীরের।

আর দ্বিধা করল না আবীর। চাদরের কোণ ধরে সাবধানে উঁচু করল। পরক্ষণে একটানে সরিয়ে দিল চাদরটা।

কারিনা নেই।

কোনো মানুষই নেই।

বালিশ আর কাপড় দিয়ে মানুষের মত বানিয়ে চাদর দিয়ে ঢেকে রেখে গেছে। ফাঁকি দেয়ার জন্য। কেউ দেখলে যাতে ভাবে, মানুষই ঘুমাচ্ছে।

উধাও হয়ে গেছে কারিনা অ্যান্ডারসন নামের রহস্যময় তরুণীটি।

মোঃ শাওন হোসেন রাজু স স্ক্যান

চার

'কারিনা নেই!' বলল বিস্মিত আবীর। ফিরে তাকাল অনিকের দিকে।

অনিকও আবীরের মতই হতবাক। চিন্তিত ভঙ্গিতে বিছানায় পড়ে থাকা বালিশগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'হয় কেউ ওকে তুলে নিয়ে গেছে, নয়তো নিজেই উঠে চলে গেছে। নিজেই গিয়ে থাকলে, জানালা দিয়ে পালিয়েছে, সেজন্যই নার্স ওকে যেতে দেখেনি।'

'কেউ নেয়নি, সে নিজেই পালিয়েছে,' আবীর বলল। জানালার দিকে তাকিয়ে আছে। জানালার পর্দাটা ধীরে ধীরে দুলছে। 'আমার

মনে হয়, কাল রাতে কেউ ওকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। কারিনা ভয় পাচ্ছিল, খুঁজতে খুঁজতে হাসপাতালে এসে হাজির হবে খুনী। সেই ভয়েতেই গায়ে শক্তি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়েছে।'

'হুঁ!' বিছানায় বসে পড়ল অনিক। 'দুটো কাজ করতে পারি এখন আমরা।'

'প্রথমটা হলো,' অনিকের কথা বুঝে ফেলেছে আবীর, 'এসব ঝামেলা থেকে পুরোপুরি দূরে থাকা, নিজেদের ছুটি উপভোগ করা; আর দ্বিতীয়টা, কারিনার রহস্যটা কী খুঁজে বের করা।'

'আমরা কিছু না করলে,' অনিক বলল, 'বিপদ কাটবে না কারিনার। আবার হামলা চালাবে খুনী। একবার খুন হওয়া থেকে বেঁচেছে, দ্বিতীয়বার আর না-ও বাঁচতে পারে। নিজেরা নাক না গলিয়ে আরেক কাজ করতে পারি আমরা, পুলিশের কাছে যেতে পারি। কিন্তু তাতে কারিনাকে যে কথা দিয়েছি আমরা, কাউকে ওর কথা জানাব না, সে-কথার বরখেলাফ হবে।'

মুচকি হাসল আবীর। 'তারমানে কাজটা নেয়ার সপক্ষে যুক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা। অত ভাবার দরকার কী? যা করতে ভাল লাগে তাই করব। অন্যায় তো কিছু করছি না। রহস্য উদঘাটনের চেষ্টাই চালাব আমরা।'

'আমিও তোর সঙ্গে একমত,' অনিক বলল। 'রহস্যটা ভেদ করতে না পারলে খুঁতখুঁতি থেকে যাবে মনে। তখন আর ছুটিটাও ঠিকমত উপভোগ করা হবে না। তারচেয়ে যা করতে ইচ্ছে করে, সেটাই করব।'

'ঠিক!'

হাত মেলাল দুজনে।

'চল এখন,' অনিক বলল, 'ওর উধাও হওয়ার খবরটা নার্সকে

গিয়ে জানাই।'

কারিনার উধাও হওয়ার খবরটা নার্সকে জানাল ওরা। এখন রোগীকে খুঁজে বের করা দায়িত্ব হাসপাতালের। ওদের আর কিছু করার নেই।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে।

'এখন ভেবে দেখা যাক,' সৈকত ধরে হাঁটতে হাঁটতে বলল আবীর, 'কারিনা সম্পর্কে আমরা কতখানি এবং কী কী জানি।'

'আমরা জানি, ভার্জিনিয়া থেকে এসেছে কারিনা,' জবাব দিল অনিক। 'আরও জানি, ইমবেলিক জনসনের কর্মচারী ও। আর ডিক বলেছে, শুধু দলের লোকেদের ছাড়া এদ্বীপে কাউকে চেনে না কারিনা।'

'স্কেহ্!' আচমকা চেঁচিয়ে উঠল আবীর। 'জনসন বলেছেন, মারমেড প্রিন্সেসকে খুঁজে পাওয়া গেছে স্কেলিটন রীফের কাছে। স্কেহ্ বলে আর শব্দটা শেষ করেনি কারিনা। নিশ্চয় স্কেলিটন রকের কথাই বলতে চেয়েছে!'

'হয়তো,' একটা নারকেল গাছের পাশ কাটাচ্ছে অনিক। 'আমার মনে হয়, কারিনাকে যে খুন করতে চায়, সে ওদের দলেরই লোক। তারমানে গুপ্তধন খুঁজতে আসা দলটা। ডিকের কথামত, দলের লোক বাদে দ্বীপের অন্য কাউকে চেনে না কারিনা।'

'তাতে দাঁড়াচ্ছে,' অনিকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আবীর বলল, 'গুপ্তধন খুঁজতে আসা দলের মাঝেই লুকিয়ে আছে এরহস্যের সমাধান। চল, জনসনকে ফোন করে জানিয়ে দিই, কারিনাকে আমর খুঁজে পাইনি। তারপর জনসনের জাহাজটা দেখতে যাব। অনুরোধ করে হোক, কিংবা যেভাবেই হোক, আমাদেরকে জাহাজে উঠতে দিতে রাজি করাব তাঁকে। জাহাজে উঠতে পারলে সরেজমিনে তদন্ত

করতে পারব। প্রতিটি কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলতে পারব। রহস্য সমাধানের সুবিধে হবে।'

'তোর বুদ্ধিটা মন্দ না,' অনিক বলল। একটা ফোনের দোকান থেকে ফোন করল জনসনকে। জানাল, কারিনার খোঁজ পায়নি। তারপর জাহাজে যাওয়ার অনুমতি চাইল।

ওদের অবাক করে দিয়ে এক কথাতেই রাজি হয়ে গেলেন জনসন। কীভাবে জাহাজে পৌঁছতে হবে, তা-ও বাতলে দিলেন অনিককে।

আধ ঘণ্টা পর ক্যারিবিয়ান সাগরের জলরাশি ভেদ করে ছুটল ওদের বোট। হিপোর চাচার পুরানো বোটটা ধার নিয়েছে। পিছনের বেঞ্চে ইঞ্জিনের কাছে বসে বোট চালাচ্ছে আবীর। মাথায় গলুইয়ের কাছে বসে কম্পাস আর ম্যাপ দেখে রাস্তা বলে দিচ্ছে অনিক। দুজনের গায়েই কমলা রঙের লাইফ জ্যাকেট।

'অনিক, দেখ, দেখ!' ইঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে চেঁচিয়ে বলল আবীর।

ফিরে তাকাল অনিক। চোখে পড়ল সেইন্ট লুসিয়ার অপরূপ দৃশ্য। দূর থেকে দ্বীপটাকে মনে হচ্ছে নীল সমুদ্রের ওপর ভাসমান সবুজ একটা পিণ্ড। সেটাকে ঘিরে রেখেছে সৈকতের সরু সাদা রেখা। দুই পাশ থেকে যেন মেঘ ফুঁড়ে উঠে গেছে রাজকীয় পিটন পর্বতের চূড়া দুটো।

দ্বীপটা যেদিকে, তার উল্টো দিকের দৃশ্যও কম সুন্দর নয়। দীগন্ত বিস্তৃত ক্যারিবিয়ানের নীল পানি। সমুদ্রের পানিতে আকাশের ছায়া। এখানে ওখানে নীল আর সবুজের ছোপ। গভীরতার তারতম্যের কারণে এমন দেখাচ্ছে পানির রঙ। কড়া রোদ। ছ্যাঁকা দিয়ে জ্বালিয়ে দিত গায়ের চামড়া যদি না বাণিজ্য বায়ু থাকত।

ফুরফুরে এই চমৎকার বাতাসে পাল তুলে দিয়ে আরেকটা নৌকাকে যেতে দেখল। ওদের কাছ থেকে বেশি দূরে না।

'সামান্য ডানে ঘোরা তো,' কম্পাস দেখে বলল অনিক।

হালের হাতল সামান্য ঠেলে দিল আবীর। ঘুরে গেল নৌকার মুখ।

তারপর একটানা চলা। মাইল চারেক যাওয়ার পর দূরে সাদা একটা বিন্দু চোখে পড়ল অনিকের। বলল, 'ওটাই হবে। জনসনের জাহাজ।'

এগিয়ে চলল বোট। যতই কাছে যাচ্ছে, বড় হচ্ছে সাদা বিন্দুটা। ধীরে ধীরে সুদর্শন একটা জাহাজে রূপ নিল।

ক্রুজার জাতের জাহাজ। চমৎকার ডেক আর কেবিন। সবচেয়ে ওপরের ডেকে বসানো মাস্তুল থেকে পতাকা উড়ছে। কালো রঙের পতাকা। মানুষের দুটো সাদা হাড়কে আড়াআড়ি রেখে ক্রস তৈরি করা হয়েছে। ক্রসের ওপরে মাঝামাঝি জায়গায় বসানো একটা মানুষের খুলি। এই পতাকার নাম জলি রোজার। জলদস্যুদের প্রতীক।

'আহয়!' হাঁক দিলেন জনসন। জাহাজীরা এভাবেই সম্বোধন করে। 'কে যায়?'

'আহয়!' সাড়া দিল অনিক। 'আমরা!'

'বাঁ দিকে বাঁধো!' জনসন বললেন।

জাহাজের বাঁ দিকে নৌকা নিয়ে গেল আবীর। নৌকার গলুইয়ে লাগানো আংটার সঙ্গে একটুকরো দড়ির একমাথা বেঁধে আরেক মাথা ছুঁড়ে দিল জনসনের দিকে। দড়ির ছুঁড়ে দেয়া মাথাটা জাহাজের সঙ্গে বাঁধলেন জনসন। সুন্দর সাদা জাহাজটায় উঠল তখন দুই গোয়েন্দা।

'হোয়াইট সোয়ানে স্বাগতম,' হেসে নাটকীয় ভঙ্গিতে স্বাগত

জানালেন জনসন।

'জাহাজটা যেমন সুন্দর, নামটাও মানানসই,' অনিক বলল। 'হোয়াইট সোয়ান। মানে, সাদা রাজহাঁস।'

'পছন্দ হয়েছে তোমাদের? খুশি হলাম,' জনসন বললেন। 'আমার জাহাজে সাধারণত বাইরের কাউকে উঠতে দিই না আমি। কিন্তু তোমরা আমাকে সহযোগিতা করছ। চক্ষুলজ্জা আর কৃতজ্ঞতা বলেও তো দুটো জিনিস আছে।'

'তা কেমন চলছে?' কড়া রোদে কর্মরত শ্রমিকদের দিকে তাকাল আবীর।

'আজকের অবস্থা ভাল না,' জনসন জানালেন। 'ডুবুরিরা আজ এখন পর্যন্ত কিছুই তুলে আনতে পারেনি। সবাই খালি হাতে ফিরেছে।'

'এখানেই সবসময় নোঙর ফেলে রাখেন নাকি?' জানতে চাইল অনিক। 'জিজ্ঞেস করলাম, তার কারণ সকালে ডকে দেখিনি জাহাজটা।'

রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে। জাহাজীদের ভাষায় এই রেলিংকে বলে 'গানল্'। বেশির ভাগ নাবিকই অশুদ্ধ উচ্চারণে বলে 'গান'এল'।

'হ্যাঁ, এখানেই রাখি,' জবাব দিলেন জনসন। জাহাজের ডানদিকে, অর্থাৎ অনিকরা যেদিকে নৌকা বেঁধেছে তার উল্টোদিকে জাহাজের গায়ে একটা মাছধরা ট্রলার বাঁধা। 'ওই ট্রলারটায় করে রোজ ডাঙা থেকে এখানে আসি আমরা। জাহাজটা সবসময় একই জায়গায় নোঙর ফেলে থাকায় রোজ রোজ আমাদের খুঁজতে হয় না ঠিক কোন জায়গাটায় ডুব দিতে হবে। জাহাজটা জায়গার চিহ্ন। আবার গার্ড টাওয়ারেরও কাজ করে।'

টপ ডেক পরিষ্কার করছে দুজন লোক। ওদের দেখিয়ে জনসন বললেন, 'ওই যে দুজনকে দেখছ, এদ্বীপেরই বাসিন্দা।'

ভাল করে দেখল অনিক-আবীর। দুজন লোকেরই গাঢ় বাদামী চামড়া। গা খোলা। শার্ট পরেনি। পেশিবহুল শরীর। বাহুর পেশি কাজ করার সময় ফুলে ফুলে উঠছে। দুজনেই বিশালদেহী। তবে একজন রীতিমত দৈত্য।

'ওর নাম অ্যান্থনি,' দুজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোটজনকে দেখিয়ে বললেন জনসন। দৈত্যটাকে দেখিয়ে বললেন, 'আর ও নুশার্ন। দুজনে চাচাত ভাই। সারারাত জাহাজে থাকে, পাহারা দেয়। জাহাজে কেউ চুরি করতে কিংবা সাগরে ডুব দিয়ে মারমেড প্রিন্সেসের গুপ্তধন তুলতে এলে দূর দূর করে খেদায়। বাজি ধরে বলতে পারি, ওদের সঙ্গে কেউ লাগতে আসার আগে দশবার চিন্তা করবে।'

'তা তো বুঝতেই পারছি,' আবীর বলল।

রিগ মরগান এগিয়ে এল জনসনের দিকে। 'নতুন যে জায়গাটায় ব্লাস্ট করব আমরা, সেখানে রওনা হতে চাই। আপনি সুপারভাইজ করবেন, না আমি করব?'

'আমার ফেলে রাখা চিহ্ন দেখেই এগোও,' নির্দেশ দিলেন জনসন। 'জায়গামত গিয়ে নোঙর ফেলার আগে আমাকে ডাক দিও।' তারপর অনিক-আবীরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন মরগানের, 'ও রিগ মরগান। আমার ফার্স্ট মেট...'

'আগেই পরিচয় হয়ে গেছে আমাদের,' বাধা দিয়ে বলল মরগান। আন্তরিকতা বোঝানোর জন্য আলতো চাপড় দিল আবীরের কাঁধে। তারপর ঘুরে গটগট করে হেঁটে চলে গেল।

'ব্লাস্ট মানে কী?' জানতে চাইল অনিক। 'বোমা ফাটাবেন?'

হালকা একটা হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল জনসনের

ঠোঁটে। 'তোমরা নিশ্চয় ভাবছ, পুরানো ওই জলদস্যুদের জাহাজটা আস্তই পেয়ে গেছি আমরা। দলে দলে লোক এখন ডুবুরির পোশাক পরে ওটার কাছে নেমে যাবে। বোমা মেরে জাহাজের ইস্পাতের বডি ভেঙে ফোকর বানিয়ে কিলবিল করে ঢুকে যাবে জাহাজের ভিতর। বড় বড় সিন্দুক ভর্তি ধনরত্ন বের করে আনবে। সিনেমাতে যেমন দেখায়। তাই না?'

'তারমানে আপনি বলতে চান ওরকম নয়?' জিজ্ঞেস করল আবীর।

'প্রথম কথা হলো,' জনসন জবাব দিলেন, 'জাহাজটার অস্তিত্বই নেই এখন ওখানে। মারমেড প্রিন্সেস তৈরি করা হয়েছিল বহুকাল আগে, কাঠ দিয়ে। ইস্পাতের জাহাজের প্রচলন তখনও শুরু হয়নি। পানির নিচে পড়ে থাকতে থাকতে বহুকাল আগেই পচে নষ্ট হয়ে গেছে জাহাজটার বেশির ভাগ কাঠ। বাকিটা ধ্বংস করেছে শামুক, গুগলি আর নানারকম জলজ প্রাণী মিলে। জাহাজে ধনরত্ন আর দামী জিনিসপত্র ছিল, সন্দেহ নেই, তবে সব ছড়িয়ে গেছে এখন স্রোতের টানে। ছড়িয়ে গিয়ে বালিতে এত গভীরভাবে ডুবে গেছে, ওপর থেকে দেখে কিছুই বোঝা সম্ভব না।'

'জাহাজটাই যদি না থাকে, তো বোমা মারবেন কিসে?' জানতে চাইল অনিক।

'বোমা মারছে কে?' হাত তুললেন জনসন। 'ওই যে, দেখো।'

বিশাল দুটো অ্যালুমিনিয়ামের পাইপের মত জিনিস জাহাজের পিছন দিকে লাগানো দেখল অনিক। মাথা দুটো কনুইয়ের মত বাঁকা হয়ে আছে।

'ওগুলোর নাম জানো?- মেইলবক্স।' জনসন বললেন। 'গুপ্তধন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এমন সব জায়গায় জাহাজের নোঙর ফেলি আমরা। মেইলবক্সের মাথায় লাগানো যন্ত্রের সাহায্যে বালিতে প্রচণ্ড জোরে ফুঁ দিয়ে গর্ত খুঁড়ি। একেই বলে ব্লাস্ট করা। এর আশেপাশে

রীতিমত ওত পেতে থাকে ডুবুরিরা। গর্ত তৈরি হলে ভিতরে খোঁজে কেউ, কেউ বা খোঁজে বাইরে, গর্তের চারপাশে। বালির সঙ্গে অন্য কোনো জিনিস বেরিয়ে আসে কিনা, দেখে।'

'মারজি, হয়েছে, চালাও এখন!' টপ ডেক থেকে হেঁকে বলল মরগান। মেইন ব্রিজটা ওখানে। লাল-চুল এক মহিলা ফার্স্ট মেটের নির্দেশে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। জাহাজটাকে এগিয়ে নিয়ে গেল বিশ ফুট সামনে।

'ব্যাস ব্যাস, হয়েছে,' মরগান বলল। 'রাখো এখানে।'

ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল মারজি।

জাহাজের চারপাশে ভালমত দেখে নিয়ে জনসন বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে। নোঙর ফেলো।'

পিছনে সরে এল অনিক-আবীর। জাহাজটাকে শক্তভাবে একই জায়গায় আটকে রাখার জন্য পিছনে দুদিক থেকে দুটো নোঙর ফেলা হয়েছে। একটা নোঙরের কাছে দাঁড়ানো ম্যাসন, আরেকটার কাছে টম। বেজিমুখো লোকটা–যার নাম ব্রডি, তাকেও দেখতে পেল অনিক। সামনে গলুইয়ের কাছে দাঁড়ানো।

'ম্যাসন,' ডেকে বললেন জনসন, 'তুমি পারবে না। তোমার জায়গায় অন্য কাউকে থাকতে বলো। অভিজ্ঞ কাউকে।'

'অভিজ্ঞ আরেকজন পাব কোথায়?' ম্যাসন জবাব দিলেন। 'এমনিতেই তো একজন কমে গেছে আজকে। কারিনা নেই। থাক, আমিই পারব। কাজ শুরু করে দাও। অকারণে সময় নষ্ট কোরো না।'

এমন ভঙ্গিতে ম্যাসনের দিকে তাকালেন জনসন, পরিষ্কার বোঝা গেল তাঁকে তিনি বিশ্বাস করছেন না। রুক্ষ স্বরে হুকুম দিলেন, 'নোঙর ফেলো!'

একটা হাতল ধরে টান দিলেন ম্যাসন। চালু হয়ে গেল একটা মোটর।

নোঙরের দড়ির দিকে তাকিয়ে আছে অনিক। সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে লম্বা, মোটা, শক্ত দড়ির স্তূপ। ম্যাসনের পায়ের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে। পুলিতে ঢোকানো আছে দড়িটা। নোঙরের টানে পুলি বেয়ে গড়িয়ে নেমে যেতে থাকবে দড়ি। অন্তত সেরকমই যাওয়ার কথা। কিন্তু গোলমাল হয়ে গেছে। মোটর চালু হতেই জাহাজ থেকে বেরিয়ে না গিয়ে বরং জাহাজের ভিতরেই উঠে আসতে থাকল নোঙর বাঁধা দড়িটা।

ভুলটা কোথায়, বুঝে ফেলল অনিক। হাতলটা ভুল দিকে টান দিয়েছেন ম্যাসন, উল্টো দিকে। তিনিও বুঝে ফেলেছেন। তাড়াতাড়ি ভুলটা শুধরে দিলেন তিনি। ধাক্কা দিয়ে অন্যপাশে সরিয়ে দিলেন হাতল। তীব্র গতিতে কুণ্ডলী থেকে দড়ি খুলে গিয়ে নোঙরের টানে সাগরে পড়তে শুরু করল। তলিয়ে যেতে লাগল পানির নিচে।

হঠাৎ করেই গোড়ালিতে তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল অনিক। দাঁড়িয়ে থাকার সাধ্য হলো না। হ্যাঁচকা টানে ডেক থেকে পা দুটো তুলে নিয়ে চিত করে ফেলে দেয়া হলো তাকে। দড়াম করে ইস্পাতের ডেকে আছাড় খেল দেহটা।

মোঃ শাওন হোসেন রাজু স স্ক্যান

পাঁচ

নিজের অজান্তেই তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল অনিকের গলা চিরে। সাহায্যের আবেদন। গোড়ালিতে পেঁচিয়ে গেছে নোঙরের দড়ি। দ্রুত

কুণ্ডলী খুলে যাচ্ছে, আর সেই দড়ির টানে তীব্র গতিতে জাহাজের পিছন দিকে চলে যাচ্ছে অনিক। একটু পরেই তার আটকে যাওয়া পা'টা দড়ির সঙ্গে উঠে ঢুকে যাবে রেলিঙে ঝোলানো পুলিতে।

সবার আগে অনিকের কাছে গিয়ে পৌঁছল আবীর। চেপে ধরে আটকাতে চাইল। পা'টা পুলির মধ্যে ঢুকে গেলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। তার আগেই ঠেকাতে হবে। কিন্তু নোঙরের টান অনেক বেশি। অনেক শক্তিশালী। ধরে রাখতে পারছে না আবীর। অনিকের সঙ্গে তাকেও টেনে নিয়ে চলল।

'বন্ধ করুন! থামান ওটা!' চেঁচিয়ে উঠল ডিক। ছুটে এল আবীরের পাশে। সে-ও চেপে ধরল অনিককে। আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'নোঙর নামানো বন্ধ করুন! জলদি!'

মোটর বন্ধ করে দিলেন ম্যাসন। দড়ি নামা থেমে গেল। কিন্তু টান কমল না। নোঙরের ভারে টানটান হয়ে আছে দড়িটা। ছুরির মত কেটে বসে যাচ্ছে অনিকের গোড়ালিতে।

যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল অনিক।

ছুটে গিয়ে নোঙর তোলার মোটরের হাতলটা উল্টো দিকে ঠেলে দিল ডিক। আবার চালু হয়ে গেল মোটর। পুলি বেয়ে দড়ি এসে ডেকে জমা হতে শুরু করল। কমে গেল দড়ির টান। চাপ কমে গেল অনিকের পা থেকে।

'আহ!' গুঙিয়ে উঠল অনিক। উঠে বসল ডেকে। গোড়ালির দিকে তাকিয়ে দেখল রক্ত বেরিয়ে ভিজে যাচ্ছে মোজা।

'এই তুমি ভাল আছো?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন জনসন। আরও কয়েকজন কর্মী দৌড়ে এসে দাঁড়াল তাঁর পাশে।

'ব্রডি, ফার্স্ট এইড কিটটা নিয়ে এসো তো,' জনসন বললেন।

'আমি ভালই আছি,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল অনিক। আহত

জায়গাটাতে প্রচণ্ড ব্যথা। বলল না কাউকে।

'ম্যাসন!' ফরাসী ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠলেন জনসন।

'শোনো! আমাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই!' গর্জে উঠে পাল্টা জবাব দিলেন ম্যাসন। 'প্রথমে ভুল দিকে চালিয়ে কিছু দড়ি তুলে এনেছিলাম বটে ডেকে। আলগা হয়ে পড়ে ছিল। কিন্তু তাতে পা ফেলল কেন ছেলেটা? বলবে, না দেখে ফেলেছে। সেটা ওর দোষ।'

'উনি ঠিকই বলছেন,' অনিক বলল। 'দোষটা আসলেই আমার। আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল আমার।'

'যা-ই বলো, আমি ওসব মানতে রাজি না,' নরম হলেন না জনসন। ম্যাসনের দিকে তাকালেন, 'তুমি আমার জাহাজে উঠলে কেন? নোঙর নিয়ে খেলতে গেলে কেন? তোমাকে জাহাজে উঠতে দেয়াটাই ভুল হয়ে গেছে আমার!'

'তোমার একজন কর্মী কম বলেই তো উঠলাম, সাহায্য করার জন্য। বরং যাদের ওঠা উচিত ছিল না, তারা হলো এই ছেলে দুটো।'

রাগে ফেটে পড়া ফরাসী ভদ্রলোকের দিকে তাকাল আবীর। তার মনে হলো, ইচ্ছে করেই দুর্ঘটনাটা ঘটিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ওদের এখানে আসাটা তাঁর পছন্দ নয়।

'এই যাও যাও,' কর্মীদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলেন জনসন। 'আর কিছু দেখার নেই এখানে। যার যার কাজে যাও। নোঙর নামাও। মেইলবক্স চালু করো।'

সঙ্গে সঙ্গে যে যার জায়গার দিকে রওনা হয়ে গেল কর্মীরা। ব্রডি এসে একটা ফার্স্ট এইড বক্স তুলে দিল জনসনের হাতে। অনিকের আহত গোড়ালিতে ওষুধ লাগাতে ঝুঁকে বসলেন তিনি। টান দিয়ে রক্তাক্ত মোজাটা খোলার সময় দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে রইল

অনিক। ভীষণ ব্যথা লাগছে।

মোজাটা খোলা হলে বিশ্রী একটা জখম দেখা গেল গোড়ালিতে।

'ভাগ্যিস, পায়ে মোজা ছিল তোমার,' জনসন বললেন। জখম হওয়া জায়গাটায় হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ঢেলে দিলেন। 'মোজা না থাকলে জখমটা অনেক বেশি খারাপ হতো। মনে হচ্ছে ভাগ্য আজ নেহায়েতই অপ্রসন্ন আমার প্রতি। প্রথমে কারিনা উধাও। তারপর এই কাণ্ড!'

পিছন দিকে তাকিয়ে আছে আবীর। মেইলবক্স অপারেট করছে যে দুজন লোক, তাদের দিকে। একজনের দাড়ি আছে, আরেকজনের ইয়া বড় গোঁফ। জনসনের কাছে জেনেছে, দাড়িওয়ালা লোকটার নাম রোজার। আর তার সঙ্গী গোঁফো লোকটা গ্রেগ। হোয়াইট সোয়ানের প্রতিটি লোকের ওপর কড়া নজর রেখেছে আবীর। কোনো সন্দেহ নেই তার, এদের মধ্যেই কেউ একজন কারিনা অ্যান্ডারসনের পিছনে লেগেছে।

ইঞ্জিন চালু করে দেয়া হয়েছে। বিচিত্র শব্দ করছে অ্যালুমিনিয়ামের মেইলবক্স দুটো। মুখ তুলে জনসন বললেন, 'ব্লাস্টিং শুরু হয়েছে।' কাঁচি দিয়ে একটা ব্যান্ডেজের প্যাকেট কাটতে শুরু করলেন তিনি। অনিকের পায়ে বাঁধার জন্য।

'মিস্টার জনসন,' পায়ের ব্যথা ভুলে থাকার চেষ্টা করছে অনিক, 'মারমেড প্রিন্সেসকে খুঁজে পেলেন কীভাবে?'

'মারমেড প্রিন্সেস ছিল ওই সময়কার স্প্যানিশ অভিযাত্রীদের আতঙ্ক। এর মালিক জলদস্যু ক্যাপ্টেন রেড বিয়ার্ডও কম কুখ্যাত ছিল না। সেসময় এই এলাকায় স্প্যানিশ জাহাজগুলোতে সবচেয়ে বেশি লুঠপাট চালিয়েছে রেড বিয়ার্ডের দল। তারপর, সতেরোশো পনেরো সালে হঠাৎ করেই গায়েব হয়ে যায় মারমেড প্রিন্সেস। কেউ

ভেবেছে আফ্রিকায় চলে গেছে রেড বিয়ার্ড। আবার কারও ধারণা ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে গিয়েছিল জাহাজটা।'

'আপনি ছাড়া আর কেউ মারমেড প্রিন্সেসের খোঁজ করেছিল?' আবীর জানতে চাইল।

'অনেকেই করেছে।' গর্বের সঙ্গে জানালেন জনসন, 'কিন্তু কেউই পায়নি।' অনিকের পায়ে ব্যান্ডেজ জড়াতে লাগলেন তিনি। 'একদিন পণ করে ফেললাম, আমি এটাকে খুঁজে বের করবই। চলে গেলাম স্পেনে। স্পেনের সেভিলিতে বিশাল এক লাইব্রেরি আছে। পুরানো স্প্যানিশ জাহাজের অজস্র লগবুক আর রেকর্ড রাখা আছে ওই লাইব্রেরিতে। পুরো একটা বছর ওই লাইব্রেরিতে কাটিয়েছি আমি। কত পড়া যে পড়েছি। ভাগ্যিস, স্প্যানিশ ভাষাটা ভালমত শিখেছিলাম।'

'তারপর?'

'মারমেড প্রিন্সেসের ওপর লেখা প্রতিটি তথ্য জোগাড় করলাম। পুরানো আবহাওয়ার রিপোর্টগুলো পড়লাম। খারাপ আবহাওয়ার সময়গুলোতে মারমেড প্রিন্সেসের অবস্থান কী ছিল, ভালমত জানলাম। হলদে হয়ে আসা পার্চমেন্ট কাগজের ওপরে পুরানো কালির লেখাগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেছে। পড়তে খুব কষ্ট হয়। সেসব লেখা পড়তে পড়তে চোখ যখন প্রায় কানা হবার জোগাড়, তখনই পেয়ে গেলাম আসল তথ্যটা। জানলাম, সতেরোশো পনেরো সালের আগস্টে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায় এই এলাকার ওপর দিয়ে। মারমেড প্রিন্সেসকে স্কেলিটন রীফের ওপর নিয়ে গিয়ে ফেলে ঝড়। এতথ্য জানার পর জাহাজটার ভাগ্যে কী ঘটেছে অনুমান করতে আর অসুবিধে হলো না। বুঝলাম, ঝড়ের ঝাপটায় প্রবাল প্রাচীরের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়েছিল জাহাজ। খোল কেটে ফালাফালা করেছিল

ধারাল প্রবাল। ডুবে গিয়েছিল জাহাজটা।'

'স্কেলিটন রীফের প্রবাল প্রাচীর তারমানে জাহাজের জন্য ভয়ানক বিপজ্জনক,' অনিক বলল।

'অকারণে কি আর স্কেলিটন রীফ নাম দেয়া হয়েছে,' হাসতে হাসতে বললেন জনসন। অনিকের ব্যান্ডেজে এখন টেপ লাগাচ্ছেন তিনি।

বাংলায় বিড়বিড় করল অনিক, 'কঙ্কাল প্রাচীর!'

'কী বললে?'

'না, কিছু না।'

ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়া হলো। থেমে গেল মেইলবক্সের বিচিত্র শব্দ। জাহাজের পিছন দিক থেকে ডুবুরির পোশাক পরা চারজন কর্মী ডাইভ দিয়ে পড়ল পানিতে। জনসনের দিকে ফিরে তাকাল আবীর। আগের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলল, 'আপনি তখন স্কেলিটন রীফে চলে এলেন মারমেড প্রিন্সেসকে খুঁজতে?'

'তুমি যত সহজে বলে ফেলছ, ব্যাপারটা আসলে অত সহজ না,' জনসন বললেন। 'মারমেড প্রিন্সেসের ভাগ্যে কী ঘটেছে, এটা জানাটা তো মাত্র ঘটনার শুরু। তারপর ধরনা দিলাম সেইন্ট লুসিয়ান সরকারের কাছে। ওদেরকে বুঝিয়ে এখানকার পানিতে জাহাজ খোঁজার অনুমতি নিতে লাগল আরও একটা বছর। তারপর আসল সমস্যা। টাকা। এধরনের অভিযানের অনেক খরচ। টাকার জোগান দেবে কে? বহু চেষ্টার পর অবশেষে টাকাও পাওয়া গেল।'

'এবং তারপর জাহাজটা খুঁজে বের করে ফেললেন আপনি,' আবীর বলল।

'উঁহু,' আবীরের বুকে এক আঙুল দিয়ে খোঁচা মারলেন জনসন। 'প্রাথমিক সব ঝামেলা শেষ করে জাহাজটা খুঁজতে শুরু করলাম

আমরা। পুরো দুই বছর ধরে এখানকার পানিতে জাহাজ নিয়ে দলবলসহ ঘুরে বেড়িয়েছি আমি, জাহাজের পিছনে ম্যাগনেটোমিটার বেঁধে সাগরতলে চষে ফিরেছি।'

'ম্যাগনেটোমিটার?' অনিক বলল, 'লোহা খোঁজার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়?'

'হ্যাঁ,' জনসন জবাব দিলেন। 'পানিতে যেখানেই লোহার সন্ধান পেয়েছি, সেখানেই ডুবুরি নামিয়ে দেখেছি। এভাবে পুরানো বহু জাহাজের ধ্বংসাবশেষ পেয়েছি আমরা, যেগুলো খোঁজা আমার লক্ষ্য ছিল না। বহুত আজেবাজে জিনিস পেয়েছি। ফেলে দেয়া ওয়াশিং মেশিনের মত জিনিসও ধরা পড়েছে আমাদের ম্যাগনেটোমিটারে। ভালমত রেকর্ড রেখেছি, যাতে ভুল করে এক জায়গায় দ্বিতীয়বার আর না খোঁজা লাগে।'

'বাপরে!' কপালের ঘাম মুছল আবীর। 'সাংঘাতিক পরিশ্রম।'

'খোকা, একটা কথা মনে রেখো,' আবীরের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখে রোদ পড়ায় চোখ মিটমিট করলেন জনসন। 'গুপ্তধন শিকার কোনো পেশা নয় নেশা। সাগরে হারিয়ে যাওয়া কোনো জাহাজ খুঁজে বের করা খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার চেয়ে অনেক কঠিন। সারাজীবন ধরে খুঁজেও দেখা যাবে ওটার ধারে-কাছেও পৌঁছাতে পারনি তুমি।'

'কিন্তু আপনার বেলায় আপনি সফল হয়েছেন,' অনিক বলল।

'সেটা আমার সৌভাগ্য।' জনসন বললেন, 'অবশেষে, দুই হপ্তা আগে, কতগুলো লোহার কামানের সন্ধান দেয় আমাদেরকে ম্যাগনেটোমিটার। ওগুলোর কাছে কতগুলো স্প্যানিশ মুদ্রা খুঁজে পাই, সতেরোশো দশ থেকে সতেরোশো ষোলোর মধ্যে বানানো। আর কিছু অলঙ্কার। রেকর্ড বুকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে শিওর হলাম,

রেড বিয়ার্ড আর তার লোকেরা ওগুলো ডাকাতি করে এনেছিল। ভালমত সবকিছু পরীক্ষা করে আর কোনো সন্দেহ রইল না, মারমেড প্রিন্সেসকে খুঁজে পেয়েছি আমরা। সেদিনটা যে কী আনন্দের দিন ছিল আমার জন্য, বলে বোঝাতে পারব না। মনে হলো যেন সব পাগলামির অবসান হলো।'

মারমেড প্রিন্সেস সম্পর্কে আরও কিছু জ্ঞান দিলেন দুই গোয়েন্দাকে জনসন। তারপর তাঁর আরও কিছু অভিযানের রোমাঞ্চকর গল্প শোনালেন। কর্মচারীদের মাসের বেতন জোগাড় করতেই নাকি ঘাম ছুটে যায় এই গুপ্তধন শিকারীদের নেতার, শুনে খুব মজা পেল অনিক। মিনিট বিশেক পরে আবার যখন পানিতে মাথা উঁচু করল ডুবুরিরা, গল্প বলায় বাধা পড়ল জনসনের।

জাহাজের ডেকে উঠে এল চার ডুবুরি। হুড়াহুড়ি করে ছুটে এল জাহাজের সবাই। ডুবুরিদের ঘিরে ধরল। মুখ থেকে মুখোশ টেনে খুলে রোজার জানাল, 'কিছু জিনিস এবারে পাওয়া গেছে।'

সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া জালের ব্যাগগুলো খুলল ডুবুরিরা। ভিতরের জিনিস বের করতে লাগল।

সবুজ পদার্থে এমনভাবে ঢেকে গেছে বেশির ভাগ জিনিস, জিনিসটা কী বোঝাই মুশকিল। জালের ভিতর থেকে কয়েকটা কালো হয়ে যাওয়া মুদ্রা পড়ল ডেকে। তারপর বেরোল আঙুলের সমান লম্বা কয়েকটা জিনিস। খাঁটি সোনার বার। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল অনিক।

'সোনার দিক থেকে কেউই চোখ ফেরাতে পারে না!' দুই গোয়েন্দার কাছে এসে বলল রিগ মরগান। খুশিতে চোখ চকচক করছে তার। 'পানিতে অনেক জিনিস নষ্ট হয়, জিনিসের চেহারা খারাপ হয়ে যায়, কিন্তু সোনার কিছুই হয় না।'

সবুজ আবরণে আবরিত জিনিসগুলো দেখিয়ে জানতে চাইল অনিক, 'এগুলোর ওপর কী পড়েছে?'

'বেশির ভাগই মরচে, তার ওপর গন্ধক,' মুখে লেগে থাকা নোনা পানি মুছল মরগান হাত দিয়ে। 'ভিতরের জিনিসগুলো কী, ওই আবরণ না সরালে বোঝা যাবে না। আঙুলের মত এই যে সোনার টুকরোগুলো দেখছ, এগুলোকে বলে ইনগট।' কালো হয়ে যাওয়া মুদ্রাগুলো দেখাল। 'আর এই রূপার মুদ্রাগুলোর নাম পিসেস অভ এইট। আমি নিজে এগুলো খুঁজে পেয়েছি।'

চশমা পরা হালকা-পাতলা রোগামত একজন লোক হাতে একটা ক্লিপবোর্ড নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন। খুঁজে পাওয়া জিনিসগুলোর কাছে হাঁটু গেড়ে বসে সাবধানে সেগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন।

'উনি কে?' জানতে চাইল আবীর। 'দেখে তো আপনাদের কোনো কর্মী বলে মনে হচ্ছে না।'

'না, আমাদের কর্মী নন,' খানিকটা অবজ্ঞার সুরেই জবাব দিল মরগান। 'উনি একজন ম্যারিন আর্কিওলজিস্ট। সেইন্ট লুসিয়ান সরকারের চাকরি করেন। ওঁর নাম হিউয়েন রডরিক।'

'উনি এখানে কেন?' জানতে চাইল অনিক।

'সেইন্ট লুসিয়ান সরকার চায় তাদের একজন লোক অবশ্যই এই গুপ্তধন উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে থাকুক,' পা থেকে ফিন খুলতে খুলতে জানাল মরগান। 'আমরা যা তুলে আনি, প্রতিটি জিনিস খাতায় লিখে রাখেন রডরিক। প্রতিদিনকার সংগ্রহ তিনি তীরে নিয়ে যান। সোনার বার আর ইনগট ব্যাংকের ভল্টে রাখেন। অন্যান্য জিনিস যেগুলোর আবরণ পরিষ্কার করা দরকার, বাহামার একটা ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দেন। রাসায়নিক ব্যবহার করে বিশেষ পদ্ধতিতে এই আবরণ

খসানো হয়, জিনিসগুলোর সামান্যতম ক্ষতি না করে। এই অভিযান শেষ–অফিসিয়ালি ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন তিনি।'

'তারমানে, সোজা কথায় বলতে গেলে,' অনিক বলল, 'কোন কিছু যাতে না হারায় কিংবা চুরি না যায়, তদারকি করার জন্যেই এই জাহাজে রাখা হয়েছে তাঁকে।'

'হ্যাঁ।'

'অভিযান শেষ হলে জিনিসগুলো কী করা হবে?' আবীর জানতে চাইল।

'ভাগাভাগি,' মরগান জবাব দিল। 'ফিফটি পার্সেন্ট পাবেন ম্যাসন, যেহেতু তিনি অভিযানের খরচ বহন করছেন। পঁচিশ ভাগ সেইন্ট লুসিয়ান সরকার। বিশ ভাগ জনসন। বাকি পাঁচ ভাগ আমাদের মত কর্মীরা।'

'পাঁচ ভাগও নিশ্চয় অনেক, তাই না?' অনিক বলল।

'অনেক টাকার জিনিস হলে তো অনেকই হবে,' জবাব দিল মরগান। 'কিন্তু কতখানি কী পাব, আগাম বলা দুঃসাধ্য। দেখা গেল, যা আশা করেছিলাম, তার কিছুই পেলাম না। এত অল্প...' একটা মুহূর্ত চুপ করে থাকল মরগান। তারপর বলল, 'স্নায়ুতে চাপ দেয়ার মত ব্যাপার আরও আছে। অভিযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটা জিনিসও বিক্রি করা যাবে না। অভিযান শেষ হতে হয়তো দুই বছর লেগে গেল। ততদিন অপেক্ষা করতে হবে। তার আগে লাভের টাকার একটা পয়সাও আমাদের পকেটে আসবে না।'

'চলে কী করে আপনাদের তাহলে? ম্যাসন বেতন দেন না?' জিজ্ঞেস করল অনিক।

'খুব সামান্য। তাতে কোনমতে খাওয়াটা চলে।' চকচকে সোনার

ইনগটগুলোর দিকে তাকাল মরগান। 'বুঝতেই পারছ, কোন পরিস্থিতিতে আছি আমরা। ভাল না, বুঝলে? সারাদিন পানিতে ডোবাডুবি করি। ভবিষ্যৎ কী, জানি না। এত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। টানাটানির মধ্যে দিন কাটানো। মেজাজ খারাপ হতে বাধ্য।'

'শুনে খারাপই লাগছে আমার,' আবীর বলল।

'মাঝে মাঝে তো প্রচণ্ড হতাশায় পেয়ে বসে,' বিশাল থাবা আপনাআপনি মুঠোবদ্ধ হয়ে গেল মরগানের। 'এতসব টেনশনের কারণেই মাঝেসাঝে অঘটন ঘটাই। আজকে সকালের মত। নানারকম দুশ্চিন্তা আর অতিরিক্ত চাপে মাথার ঠিক ছিল না তখন। এখন ভাবতে খারাপ লাগছে। এরকম না করলেও পারতাম।'

ডুবুরির পোশাক পরা আরও চারজন কর্মী ডাইভ দিয়ে পানিতে পড়ল।

গোয়েন্দাদের কাছে এগিয়ে এলেন জনসন। 'তোমরা ডাইভিং জানো? ডুবুরির পোশাক পরে সাগরে ডুব দিয়েছ কখনও?'

'হ্যাঁ, দিয়েছি!' অনিক জানাল।

'এখন দিতে চাও?'

'চাই!' একসঙ্গে বলে উঠল দুই গোয়েন্দা। উত্তেজিত কণ্ঠে আবীর বলল, 'ডুবুরির বাড়তি পোশাক আছে নাকি আপনার জাহাজে?'

'আছে,' জনসন জানালেন। 'তবে অনিক যেতে পারবে না। তার পায়ে জখম। রক্ত বেরোয় এরকম কোন ক্ষত নিয়ে সাগরে ডুব দেয়া নিষেধ। তবে তুমি যেতে পারবে। রীফের নিচটা যদি দেখতে চাও, যেতে পারো। ডিককে বলো, ব্যবস্থা করে দেবে।'

'থ্যাংকস!' বলে লাফাতে লাফাতে ছুটল আবীর। খানিক পরেই

ফিরে এল সাগরে ডুব দেয়ার উপযোগী রবার সুট, অক্সিজেন মাস্ক, ফিন, ডুবুরির ঘড়ি, ওয়েইট বেল্ট এসব পরে। পিঠে বাঁধা অক্সিজেন ট্যাংক।

'তিরিশ মিনিট চলার মত অক্সিজেন পাবে তোমার ট্যাংকে।' আবীরের পিঠের ট্যাংকে অক্সিজেন ভরে দিতে লাগল ডিক। 'বেশি দূরে যেও না। ঘড়ির দিকে কড়া নজর রাখবে।'

'বুঝলাম,' মাস্কটা তোলা ছিল। টেনে নামিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল আবীর ঠিকমত ফিট করছে কিনা।

'আশ্চর্য!' ট্যাংকে অক্সিজেন ভরার কমপ্রেসর যন্ত্রটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে ডিক।

'কী?' আবীর জানতে চাইল।

'কমপ্রেসরের সিলিন্ডারে যতখানি অক্সিজেন থাকার কথা তারচেয়ে কম আছে!' মিটারের কাঁটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল ডিক। 'শিওর নুশান আর অ্যান্থনি এই অক্সিজেন খরচ করেছে। রাতে ডুব দিয়েছে সাগরে। কাজটা ঠিক করেনি, যদিও তাতে কিছু এসে যায় না।...হয়ে গেছে। যাও। আবীর, ভালয় ভালয় ফিরে এসো।'

'আসব,' মাথা ঝাঁকাল আবীর। জাহাজের কিনারে হেঁটে গেল। বিশাল কোলাব্যাঙের পায়ের পাতার মত থপ থপ করে টেনে নিয়ে গেল পায়ে পরা ফিন দুটো। মাউথপিস মুখে পরে বাতাস টানল ট্যাংক থেকে। ঠিকই আছে। ডুবুরির ঘড়ির সুইচ টিপে চালু করে দিল ঘড়িটা। তারপর দেহটাকে সোজা রেখে লাফ দিল। নিখুঁত ভঙ্গিতে ঝপাং করে পড়ল পানিতে।

কোমরের ভারি বেল্ট দ্রুত ওকে পানির নিচে টেনে নিয়ে চলল। পানির জগতের চারপাশে নজর বোলাল সে। কাঁচের মত পরিষ্কার

পানি। ওপরে দেখা যাচ্ছে হোয়াইট সোয়ানের ধবধবে সাদা খোল।

দম নাও। নিজেকে মনে করিয়ে দিল আবীর।

খোলের পিছনে সাগরের নিচে বালির মেঘ চোখে পড়ল। মেইলবক্সের সৃষ্ট পানির ঘূর্ণি ওই বালির মেঘ তৈরি করেছে। আরও খানিকটা নামার পর তিনজন ডুবুরিকে অস্পষ্ট চোখে পড়ল। সাগরতলে নেমে পানি ও বালির মিশ্রিত ঘূর্ণির কাছে বালিতে জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা।

ওদের কাছে পরে যাব, ভাবল আবীর। আগে রীফটা একটু ঘুরে দেখে আসি। ফিন লাগানো পায়ের পাতা নেড়ে মাছের মত দ্রুত সাঁতরে চলল প্রবাল প্রাচীরের দিকে।

থাকে থাকে জন্মানো প্রবাল, সাগরের নিচ থেকে পানির ওপরিভাগের কাছাকাছি উঠে গেছে। কিছু কিছু প্রবাল আছে দেখলে মনে হয় খুবই নরম, কিন্তু পাথরের চেয়ে কোন অংশে কম শক্ত নয় ওগুলো। ক্ষুরের মত ধারাল। অসাবধানে হাত দিতে গেলেই হাত কাটবে। ডুবুরির জন্য মারাত্মক।

সাঁতরাতে সাঁতরাতে স্কেলিটন রীফের একেবারে ওপরে চলে এল সে। চোখ জুড়ানো দৃশ্য। সাগরতল থেকে বিশাল ফুলের পাপড়ির মত ছড়িয়ে পড়েছে কোনটা, কোনটা চতুর্দিকে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। আর কী তার রঙ! সবুজ, গোলাপি, কমলা, হলুদ। রোদ পড়ে উজ্জ্বল ফ্লোরেসেন্ট বাতির মত যেন জ্বলছে, হাত বাড়িয়ে ডাকছে ছোঁয়ার জন্য, ধরে তোলার জন্য। কিন্তু প্রবালের সেই ফাঁকিতে পড়ল না আবীর। জানে, ওগুলোর কাছ থেকে দূরে থাকাই ভাল। কোনভাবেই ঘষা লাগানো চলবে না।

প্রবালের ডালপালার ফাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাছ। শত শত। প্রবালের মতই বিচিত্র তাদের রঙ। কোন কোনটা রঙিন

কাঁচের মত। ভিতর দেখা যায়। তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় ভুলে গেল আবীর, কোথায় রয়েছে। মনে হতে লাগল, অপরূপ এক পরীর রাজ্যে ঢুকে পড়েছে।

হঠাৎ চোখে পড়ল ওটাকে!

বড় একটা মাছ!

প্রবালের দিকে ছুটে আসছে।

খানিক পরেই বুঝল, তার দিকেই আসছে মাছটা। নিশ্চয় তাকে নড়তে দেখেছে। সে যে একটা প্রাণী, বুঝে ফেলেছে। মাছের খুদে মগজে খবর চলে গেছে: খাবার! জলদি যাও!

মাউথপিসের সাহায্যে ট্যাংক থেকে ঘন ঘন বাতাস টানল আবীর। নিজের অজান্তেই ভারি হয়ে এল নিঃশ্বাস।

দূর থেকে দেখেও মাছটাকে চিনতে কোনই অসুবিধে হলো না তার।

হাঙর!

মোঃ শাওন হোসেন রাজু স স্ক্যান

ছয়

এসব ক্ষেত্রে যা হয়, দেখামাত্র পলায়নের চিন্তা–সেটাই ঢুকল তার মাথায়ও। কিন্তু ডুবুরি হিসেবে নতুন নয় সে। জানে, এরকম করতে যাবার বিপদ। সাঁতরে হাঙরের সঙ্গে পারা সম্ভব নয়। চোখের পলকে ওকে ধরে ফেলবে ওটা। যে কোনো নড়াচড়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাঙরের। কী নড়ছে দেখার জন্য ছুটে আসে। তারচেয়ে বরং যা করা উচিত এখন, তা হলো মাথা ঠাণ্ডা রেখে চুপচাপ ভেসে থাকা।

আবার লম্বা দম নিল সে। রক্তের মাধ্যমে সারা শরীরে নতুন করে ছড়িয়ে দিল অক্সিজেন। দেহটাকে শান্ত রাখার জন্য। মগজটাকে বিক্ষিপ্ত হতে দেয়া যাবে না এখন কোনমতেই।

মসৃণ গতিতে পানির মধ্যে দিয়ে যেন উড়ে আসতে লাগল হাঙরটা। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতি। লম্বা শরীর। চকচকে, নীলচে-ধূসর চামড়া। দেহের দুই পাশের দুটো বড় বড় পাখনা অনেকটা অ্যারোপ্লেনের ডানার মত ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে হাঙরকে।

আরও একটা কথা জানে আবীর, হাঙর বিপজ্জনক প্রাণী হলেও তাকে অতিরিক্ত ভয়াল করে তোলার ব্যাপারটা নেহায়েতই অপপ্রচার। তবে মানুষের মাংসে খুব একটা অরুচিও নেই হাঙরের। সুযোগ দিলে ঠিকই কামড় বসাবে।

ছায়ার মত নিঃশব্দে কাছে চলে আসছে হাঙরটা। মাথার অনেক পিছনে বসানো ওটার হলদেটে চোখজোড়া এখন দেখতে পাচ্ছে আবীর। চোখে পড়ল বিশাল মুখের ভিতরে বসানো সারি সারি ক্ষুরধার দাঁত।

ভারি দম নিল আবার আবীর। নিজেকে বোঝাল, নোড়ো না! তোমার প্রতি আকৃষ্ট কোরো না প্রাণীটাকে!

কাছে চলে এল হাঙর। আবীরকে ঘিরে ঘুরতে শুরু করল। আবীর জানে, চোখের চেয়ে পানির কম্পনের ওপর বেশি নির্ভর করে হাঙরেরা। কম্পনের মাধ্যমে বুঝে নেয় প্রাণীটা কী, কিংবা কোন প্রজাতির। এই হাঙরটাও তাই করল। বেশ কয়েকবার আবীরকে লক্ষ্য করে চক্কর দেয়ার পর যখন মনে হলো ওটার—নাহ্, কিম্ভূত এই প্রাণীটা মুখরোচক হবে না, ধীরে ধীরে সাঁতরে দূরে চলে গেল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আবীর। ওর মাউথপিস থেকে দ্রুত কিছু খুদে বুদবুদ উঠে গেল ওপরে। সতর্কতায় ঢিল দিল না সে। একটা বিপদ থেকে বেঁচেছে, যে কোনো মুহূর্তে আরও বিপদ এসে হাজির হতে পারে। 'সাগরের নিচে নেমে কখনই অসাবধান হওয়া যাবে না, সাগরকে অবহেলা করা চলবে না, তাহলে ভয়ানক বিপজ্জনক হয়ে উঠবে সাগর,' ডাইভিং কোচের কথাগুলো কানে বাজতে লাগল তার।

ঘড়ি দেখল সে। ডুব দেয়ার পর মাত্র সাত মিনিট পেরিয়েছে। হাতে এখনও বাইশ-তেইশ মিনিট সময় আছে। স্কেলিটন রীফ দেখা হয়েছে। হোয়াইট সোয়ানের ডুবুরিদের কাছে যাওয়া দরকার। বলা যায় না, জরুরী কোনো সূত্রও পেয়ে যেতে পারে ওখানে, যেটা কারিনা-রহস্যের সমাধানে সাহায্য করবে।

সাঁতরানো শুরু করল সে। ডুবুরিরা যেদিকে কাজ করছে সেদিকে এগোল এবার। প্রবাল প্রাচীরের কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে রয়েছে ওরা। কিছুদূর এগোতে তার বেশ কিছুটা নিচে ব্রডিকে চোখে পড়ল। ছুটাছুটি করে বালিতে হাতড়ে বেড়াচ্ছে গুপ্তধনের আশায়।

মেইলবক্স দুটো যেখানে বালির মেঘ সৃষ্টি করেছে, সেখানে পৌঁছল আবীর। দুটো গর্ত চোখে পড়ল তার। চার ফুট গভীর। যন্ত্রের সাহায্যে ব্লাস্টিং করে বানানো হয়েছে।

বালির মেঘের ভিতরে টম আর গ্রেগকে চোখে পড়ল। একটা গর্তের ভিতরে বেলচা দিয়ে খোঁচাচ্ছে দুজনে। পায়ের সঙ্গে বাঁধা ছুরি–ডাইভিং নাইফ। হাতের কব্জিতে বাঁধা জালের থলি।

মাথার ওপরে ভেসে থেকে কয়েক মিনিট ওদের কাজ দেখল আবীর। বালি থেকে কী যেন একটা টেনে বের করতে দেখল টমকে। গ্রেগকে দেখাল সেটা টম। খুব আগ্রহ নিয়ে জিনিসটা দেখছে দুজনে।

কৌতূহল হলো আবীরের। কী পেয়েছে ওরা দেখার জন্য আরেকটু নিচে নেমে গেল। পানির নিচে পাওয়া অন্যান্য জিনিসের মতই এটাও সবুজ আবরণে ঢাকা, কিন্তু তারপরেও চিনতে অসুবিধে হলো না। চামড়ার জুতো। তিনশো বছর আগে জিনিসটা পরা ছিল একজন জলদস্যুর পায়ে, জাহাজের ডেকে হেঁটে বেড়াত লোকটা আর দশজন জ্যান্ত মানুষের মত, কিন্তু এখন নেই সে-ভাবতে কেমন লাগল আবীরের।

জুতোটা থলিতে রেখে দিল টম। অন্য গর্তটায় কী আছে দেখার জন্য ঘুরল আবীর। মারজি নামের সেই লাল-চুলওয়ালা মহিলা একাকী কাজ করছে এগর্তটায়। টম আর গ্রেগের মতই ঘূর্ণায়মান বালির মেঘের মধ্যে দাঁড়িয়ে বেলচা দিয়ে একমনে গর্তের দেয়াল খোঁচাচ্ছে মহিলা। তার গভীর মনোযোগই বলে দিচ্ছে, গর্তের ভিতরে কোনো জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার। বের করে আনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রতিটি খোঁচার সঙ্গে সঙ্গে আরও বালি উঠে আসছে।

বালির সঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে এল ছোট ছোট কতগুলো চকচকে জিনিস। চিনতে পেরে হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হলো আবীরের। সোনার মোহর। পানি ভেদ করে এত নিচেও রোদের আলো চলে আসছে। মোহরগুলোর পিঠে সে-আলো লাগলেই ঝিক করে উঠছে। দৃশ্য বটে! কেমন অবাস্তব মনে হয়।

মারজির ঠিক মাথার ওপরেই রয়েছে আবীর। কিন্তু নিজের কাজে এতই ব্যস্ত মহিলা, আবীরকে দেখলই না। পানিতে ভেসে ওঠা মোহরগুলো খাবলা দিয়ে ধরে ধরে জালের ব্যাগে ভরতে শুরু করল। তবে বেশির ভাগ মোহরই ধীরে ধীরে নেমে গিয়ে জমা হচ্ছে গর্তের তলায়। সেগুলো তোলার জন্য গর্তে নামল মারজি।

তারপরের দৃশ্যটা সতর্ক করে তুলল আবীরকে। পরনের ওয়েট

সুটের ওপরের অংশের অর্থাৎ বুকের কাছের জিপার খুলল মারজি। কয়েক মুঠো মোহর তার ভিতরে ঢুকিয়ে জিপার লাগিয়ে দিল আবার।

সমস্ত মোহর কুড়িয়ে নেয়ার পর আবার গর্তের দেয়ালে খোঁচানো শুরু করল মারজি। সবুজ আবরণে মোড়া আরও কতগুলো জিনিস বের করে আনল। কিছু রাখল ব্যাগে। আবারও ওয়েট সুটের জিপার খুলে ছোট ছোট কয়েকটা জিনিস ঢুকিয়ে রাখল মোহরের সঙ্গে।

অবশেষে ঘড়ি দেখল মারজি। গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে ওপরে উঠতে শুরু করল। দ্রুত সাঁতরে সরে গেল আবীর। দূর থেকে নজর রাখল মারজির ওপর। বালি মিশানো পানির ভিতর দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে মারজি। নিজের ঘড়ির দিকে তাকাল আবীর। বাইশ মিনিট পেরিয়েছে। তারও যাবার সময় হয়েছে। মারজিকে অনুসরণ করে সে-ও উঠতে শুরু করল।

পানিতে মাথা তুলল আবীর। মারজি তখন জাহাজের পাশে লাগানো মই বেয়ে উঠে যাচ্ছে। সাঁতরে কাছে এল আবীর। মই বেয়ে সে-ও উঠতে শুরু করল। উঠে এল জাহাজের ডেকে।

টান দিয়ে মাস্ক খুলল সে। দাঁতে কামড়ে রাখা মাউথপিসটা খুলে নিল। জালের ব্যাগটা ডেকে নামিয়ে রাখতে দেখল মারজিকে। ডেকেই দাঁড়িয়ে আছেন হিউয়েন রডরিক। ডিক আর গ্রেগের তুলে আনা জিনিসগুলোর নাম রেজিস্টারে তুলে নিচ্ছেন।

এগিয়ে এল অনিক। আবীরকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগল?'

'লাল-চুল ওই মহিলা...!' এদিক ওদিক তাকিয়ে কেউ শুনছে কিনা দেখল আবীর।

অনিক জিজ্ঞেস করল, 'মহিলা কী করেছে?'

'খুঁজে পাওয়া কিছু মোহর আর কয়েকটা ছোট জিনিস ওয়েট

সুটের ভিতর লুকিয়ে ফেলেছে,' ফিসফিস করে বলল আবীর। 'জালের থলিতেই জায়গা হয়ে যেত ওগুলো। ওখানে রাখেনি। আর্কিওলজিস্টকেও দেয়নি। তারমানে চুরি করার মতলব। ভাবছি, এর সঙ্গে কারিনার ঘটনাটার কোন সম্পর্ক নেই তো? ওই প্রবাদটা তো জানিস: যেখানে একটা অপরাধ ঘটে, সেখানে আরও অপরাধ ঘটতে পারে!'

রডরিকের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে মারজি। তাকিয়ে আছে অনিক-আবীর। একে একে ডুবুরির সমস্ত সরঞ্জাম গা থেকে খুলে নিল মারজি, শুধু ওয়েট সুটের ওপরের অংশটা বাদে। তারপর গলুইয়ের দিকে এগোল। সেখানে একটা কাপড়ের ব্যাগ রাখা। ব্যাগটা তুলে নিয়ে মই বেয়ে জাহাজের ডেকের নিচে তার কেবিনে চলে গেল সে।

'তুই এখানে থাক,' অনিক বলল। 'আমি দেখে আসি।'

মারজি চলে যাওয়ার পর একটা মুহূর্ত অপেক্ষা করল অনিক। তারপর দ্রুত এগোল কেবিনগুলোর দিকে। একটা দরজা পার হয়ে এসে বদ্ধ করিডরে ঢুকল। ডানে একটা দরজার গায়ে লেখা: রেস্ট রুম। উল্টোদিকে বাঁয়ের আরেকটা দরজার গায়ে লেখা: স্টোর। করিডরের শেষ মাথায় আরও দুটো ঘর।

রেস্ট রুমের ভিতর থেকে পানি পড়ার শব্দ কানে এল।

মারজি আছে ভিতরে, বুঝতে পারল অনিক।

দরজার কাছে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

*

ডুবুরির পোশাক আর সরঞ্জামগুলো সব ফেরত দিয়ে এল আবীর। গলুইয়ের কাছে বসে থাকতে দেখল ম্যাসনকে। একটা পেপারব্যাক বই পড়ছেন। চারপাশের সাগর, এখানে কী ঘটছে, কোনো কিছু নিয়েই তাঁর এমুহূর্তে বিশেষ আগ্রহ কিংবা মাথাব্যথা আছে বলে মনে

হলো না। ম্যাসনকে সন্দেহের তালিকার শীর্ষে রেখেছে আবীর। কারণ তিনিই কারিনাকে শেষ দেখেছেন। আর অনিকের গোড়ালিতে দড়ি পেঁচানোর জন্যও মনে মনে তাঁকেই দায়ী করছে আবীর।

'হাই,' ম্যাসনের কাছে গিয়ে ডাকল সে।

'কে?' এক মুহূর্তের জন্য বই থেকে মুখ তুলে তাকালেন ম্যাসন। 'ও, তুমি।'

পাশে রাখা সানস্ক্রীন লোশনের একটা বোতল চোখে পড়ল আবীরের। 'স্যালভিজ শিপে কি প্রায়ই আসেন আপনি?'

'না,' বই থেকে মুখ না তুলে জবাব দিলেন ম্যাসন।

'আচ্ছা, এধরনের অভিযানে কি এই প্রথম টাকা খাটালেন? নাকি আরও খাটিয়েছেন?'

'না,' আবারও বই থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিলেন ম্যাসন।

'আপনার আসল ব্যবসাটা কী?'

'কলা,' বিড়বিড় করে জবাব দিলেন ম্যাসন।

'আহ, কলা! দারুণ ফল।' আলাপ জমানো ভঙ্গিতে বলল আবীর। 'আপনার আগে আর কোনো কলার ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা হয়নি আমার। কলা আমার ভীষণ পছন্দ। কলা দিয়ে একটা খাবার বানিয়ে দেখেছেন? আইসক্রীমের সঙ্গে কুচি কুচি করে কাটা পাকা কলা, আর...'

'দেখো, ছেলে,' হাতের বইটা আছাড় দিয়ে নামিয়ে রাখলেন ম্যাসন। 'এজাহাজে কেন উঠেছ তোমরা, বুঝতে পারছি না। তবে আর কখনও উঠবে না বলে দিলাম। তোমার আর তোমার বন্ধুর বীমা করানো নেই আমার গ্রুপ ইন্সুরেন্স পলিসিতে। এখানে বিপদ আছে, বুঝলে? যদি বেশিরকম জখম হয়ে যাও, খরচাটা যাবে তখন আমার পকেট থেকে। তা ছাড়া আসামীর মত জেরা করছ কেন আমাকে?

আমি এসব পছন্দ করি না। বুঝলে?'

মাথা ঝাঁকাল আবীর।

'গুড। যাও এখন।'

বইটা তুলে নিয়ে আবার পড়ায় মন দিলেন ম্যাসন।

'থ্যাংক ইউ,' বলে ওখান থেকে সরে এল আবীর।

*

নিচের ডেকে তখনও রেস্ট রুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে অনিক।

অবশেষে বেরিয়ে এল মারজি। অনিককে দেখে চমকে গেল। 'আরে, তুমি! মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি? সরি।'

'না না, ঠিক আছে,' হাসিমুখে জবাব দিল অনিক। 'আমার নাম অনিক রায়হান।'

'আমি মারজি পিটম্যান,' হাত বাড়িয়ে দিল সে।

মহিলার বয়েস বিশের কোঠায়, অনুমান করল অনিক। মুখে প্রচুর লাল তিল। চোখের মণির রঙ সবুজঘেঁষা। মোটামুটি আকর্ষণীয় চেহারা। ইংরেজিতে কথা বলছে, কিন্তু তাতে অদ্ভুত এক ধরনের টান।

'আপনার দেশ কোথায়?' জানতে চাইল অনিক।

'আয়ারল্যান্ড।'

'ওরিব্বাবা, অতদূর!' দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল অনিক। 'ক্যারিবিয়ানে এলেন কীভাবে?'

'গুপ্তধন শিকারীরা এরকমই, দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়ে,' কড়া আইরিশ টানে জবাব দিল মহিলা। 'বলতে পারো, ঘুরতে ঘুরতেই চলে এসেছি। আমাদের চরিত্রের মানুষেরা কখনও এক জায়গায়

বেশিদিন থাকতে পারে না। নিয়মিত কোনো কাজে লেগে থাকতে পারে না। আর একারণে এই স্বভাবের মানুষদের চমৎকার একটা নাম রাখা হয়েছে: অস্থির প্রেতাত্মা।'

'নামটা দারুণ তো! মনে হচ্ছে আরও একজন অস্থির প্রেতাত্মা গতকাল এই অস্থিরতার স্বীকার হয়েছেন,' হেসে জবাব দিল অনিক। 'যে মহিলাটি আজকে গড়হাজির রয়েছেন জাহাজে। হয়তো কাজ ছেড়ে পালিয়েছেন।' মনে করার ভান করল অনিক, 'কী যেন মহিলার নাম?'

'কারিনার কথা বলছ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, কারিনা। তিনিও হয়তো এক জায়গায় ভাল না লাগায় ভেগে চলে গেছেন।'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল মারজি, 'অস্থির প্রেতাত্মা যদি হয়ও, কারিনা ভেগে চলে গেছে, একথাটা আমি মানতে পারছি না। নিজের জিনিসপত্র তো কিছুই নিয়ে যায়নি।'

'কীভাবে জানলেন?'

'সোফ্রিয়ারে ছোট্ট একটা বাংলো শেয়ার করে থাকি আমরা,' মারজি জানাল। 'বাংলো না বলে ওটাকে কুঁড়ে বলাই ভাল। আমাদের মত ভাসমান মানুষদের আরেকটা দুর্গতি হলো দারিদ্র। নিয়মিত কোনো কাজ না করলে যা হয়। পকেট এত খালি থাকে আমাদের, অনেক সময় রুটি কিনে খাওয়ার টাকাও থাকে না।'

'এখন নিশ্চয় খারাপ অবস্থা নয় আপনাদের,' অনিক বলল। 'কম হলেও কিছু বেতন তো নিয়মিত পাচ্ছেন ম্যাসনের কাছ থেকে।'

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল মারজির। জবাব দিল না।

'কারিনাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে না আপনার?' জিজ্ঞেস করল অনিক।

'তা তো কিছুটা হচ্ছেই। তবে আমাদের মত ভাসমানরা লড়াই করে টিকে থাকা মানুষ। অত দুর্বল নয় যে ফুঁ লাগলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মনে করি, নিজেকে বাঁচানোর ক্ষমতা আছে কারিনার।'

'ও কোথায় গিয়ে থাকতে পারে, কিছু ধারণা করতে পারেন?'

'উকিলের মত অত জেরা করছ কেন বলো তো? গোয়েন্দা নাকি তুমি?' মারজির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন ছুরির ফলার মত ভেদ করে গেল অনিককে।

'না, একজন কৌতূহলী বালক,' তরল রসিকতার ভঙ্গিতে মারজির প্রশ্নটা উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল অনিক।

মনে হলো ওকে বিশ্বাস করল মারজি। 'না, কোন কিছুই ধারণা করতে পারছি না। তবে একটা কথা বলতে পারি, মেয়েটা খুব ভাল। লাজুক স্বভাব। নিজের মনে একলা থাকতেই পছন্দ করে। সেকারণেই তার কোনো বন্ধু নেই দ্বীপে। অথচ আমাদের সবারই আছে।...তোমার কথা শেষ হয়েছে? আমাকে ওপরে যেতে হবে। কাজ পড়ে আছে।' হাঁটতে শুরু করল মারজি। ফিরে তাকিয়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল, অনিক।'

চলে গেল মারজি।

মারজির কথা কতখানি বিশ্বাস করবে, বুঝতে পারছে না অনিক। কেবিন এরিয়ায় আরও খানিকক্ষণ থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে। ঘুরেফিরে দেখার জন্য।

একটা ঘরের দরজা খোলা পেয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিল ভিতরে। রেফ্রিজারেটর, স্টোভ, রান্নার সরঞ্জাম ইত্যাদি দেখে বোঝা গেল এটা জাহাজের রান্নাঘর।

এটাতে না ঢুকে অন্য আরেকটা ঘরে ঢুকল সে। দুটো সরু বিছানা আর একটা ডেস্ক রয়েছে এঘরে। কিছু কাপড় পড়ে আছে

মেঝেতে। তার মনে হলো, নিশ্চয় অ্যান্থনি আর নুশানের।

ডেস্কে রাখা কিছু কাগজপত্রে চোখ আটকে গেল অনিকের। এগিয়ে গেল। একটা কাগজে কিছু নামের তালিকা রয়েছে। বর্তমান ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বরও লেখা রয়েছে নামের পাশে। হোয়াইট সোয়ানের কর্মচারী এরা। প্রতিটি নামের পাশে একজন করে প্রিয়জন কিংবা আত্মীয়র নাম-ঠিকানা লেখা রয়েছে, কর্মচারীদের কেউ হঠাৎ করে গুরুতর জখম হলে কিংবা মারা গেলে যাতে জাহাজ-কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করতে পারে।

ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে তালিকাটার আরেকটা কপি পেয়ে গেল অনিক। ভাঁজ করে কাগজটা নিজের পকেটে ভরে রাখল।

এরপর রীফ এলাকার বড় একটা ম্যাপের দিকে নজর দিল। হঠাৎ খুট করে শব্দ হলো। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল অনিক। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল অ্যান্থনিকে।

'হ্যাল্লো, মান,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল অ্যান্থনি।

'হাই,' অপ্রস্তুত হয়ে গেছে অনিক। কী জবাব দেবে বুঝতে পারছে না। 'আমি...ইয়ে...একটু ঘুরেফিরে দেখছিলাম।'

নীরবে ঘরের কোণে গিয়ে একটা রাইফেল তুলে নিল অ্যান্থনি। অস্ত্রটা আগে চোখে পড়েনি অনিকের।

ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একবাক্স গুলি বের করল অ্যান্থনি। কয়েকটা গুলি ভরল চেম্বারে।

'একটু ঘুরেফিরে দেখছিলে, তাই না?' খটাস করে রাইফেলের চেম্বার বন্ধ করল অ্যান্থনি।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল অনিক। ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে রাইফেলটার দিকে। বলল, 'দারুণ জাহাজ আপনাদের।'

রাইফেলটা চোখের সামনে তুলে ধরে অনিককে নিশানা করল

অ্যান্থনি।

ঢোক গিলল অনিক। পৃথিবীকে তার বিদায় জানানোর শেষ সময় কি উপস্থিত?

মোঃ শাওন হোসেন রাজু'স স্ক্যান

সাত

'কী?' রাইফেলটা অনিকের দিকে তাক করে রেখে ভুরু নাচাল অ্যান্থনি, 'ভয় পাচ্ছ না তো?'

'তা তো পাচ্ছিই,' কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য শান্ত রাখার চেষ্টা করছে অনিক। 'আমাকে গুলি করতে চাইছেন কেন, বলবেন?'

হাসি ছড়িয়ে গেল অ্যান্থনির মুখে। 'কে তোমাকে গুলি করছে? একটু মজা করলাম।' রাইফেল নামাল সে। বাঁটে চাপড় দিয়ে বলল, 'এটা তোমার জন্য না।'

'কিন্তু গুলি ভরলেন যে?'

'দরকার আছে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অ্যান্থনি। কেবিন এরিয়া থেকে চলে গেল। কার জন্য রাইফেল নিয়ে যাচ্ছে, অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে অ্যান্থনির পিছু নিয়ে ডেকে উঠে এল অনিক।

জাহাজের সামনের দিকে গানলের কাছে দাঁড়ানো দেখা গেল জনসন, আবীর, নুশান আর আরও কয়েকজনকে। রাইফেল হাতে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল অ্যান্থনি। পিছে পিছে গেল অনিক।

কপালে হাত দিয়ে রোদ বাঁচিয়ে সামনে তাকাল। একটা বোট দেখতে পেল। পানি কেটে এগিয়ে আসছে হোয়াইট সোয়ানের

দিকে। ফাইবারগ্লাসে তৈরি বডি। শক্তিশালী ইঞ্জিন লাগানো পাওয়ারবোট। ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে অট্টহাসির শব্দ কানে এল অনিকের।

'দরকার না পড়লে গুলি কোরো না,' বোটের দিকে তাকিয়ে থেকে অ্যান্থনিকে বললেন জনসন।

'না, করব না,' অ্যান্থনির জবাব।

'কে আসছে?' জনসনকে জিজ্ঞেস করল অনিক।

'নীল আর কেয়ান,' গম্ভীরকণ্ঠে জবাব দিলেন জনসন। 'অস্ট্রেলিয়ান। ভীষণ পাজি। মড়িখেকো।'

'বুঝলাম না। মরা মানুষের মাংস খায়?'

'উঁহু। মড়িখেকো বললাম অন্য কারণে। শকুন যেমন মড়ির গন্ধ পায়, ঠিক তেমনি করে ওরাও গুপ্তধনের গন্ধ পেয়ে যায়। সাগরে ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে কেউ গুপ্তধন উদ্ধার করে নিরাপদে নিয়ে যেতে পারে না। বাগড়া দেবেই। কী করে যে খোঁজ পায়, ঈশ্বরই জানে। ঠিক গিয়ে হাজির হয়। তবে আমি ওদের কেয়ার করি না। সেটা ক্যারিবিয়ানেই হোক, ভূমধ্যসাগরেই হোক, আর আমাজানেই হোক।'

'হাজির হয়ে কী করে?' জানতে চাইল আবীর।

'বখরা আদায়ের চেষ্টা করে।' প্রচণ্ড ঘৃণায় পানিতে থুতু ফেললেন জনসন। 'না দিলে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করে। তা-ও না পারলে রাতে ডুবুরির পোশাক পরে চুপি চুপি পানির নিচ দিয়ে এসে চুরি করে। একবার একজনের বোটের খোলে বোমা মেরে বোট ডুবিয়ে দিয়েছিল, এমনই শয়তান। নোংরা কুকুর ওরা। উন্মাদ খুনী। মড়িখেকো।'

একটু পরেই হোয়াইট সোয়ানের গা ঘেঁষে থামল বোটটা। ইঞ্জিন

চলছে। বোটে দাঁড়ানো লোক দুজনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আবীর। একজন বেঁটে। নাকটা ঈগলের নাকের মত বাঁকা। অন্যজন লম্বা। একগালে বিশ্রী একটা লম্বা কাটা দাগ। দুজনের মাথায়ই লম্বা চুল। বেজবল ক্যাপ পরা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কতদিন কামায় না কে জানে। বয়েস চল্লিশের কোঠায়।

'বেঁটে লোকটার নাম নীল,' দুই গোয়েন্দাকে জানালেন জনসন। 'লম্বাটা কোয়ান।'

'আহয়, ক্যাপ্টেন জনসন!' হাঁক দিল নীল। 'শুনলাম আপনারা নাকি অনেক গুপ্তধন পেয়েছেন?'

'ধনরত্ন, গহনা,' হাসিমুখে সঙ্গীর কথায় সুর মিলাল কোয়ান। কথায় কড়া অস্ট্রেলিয়ান টান।

'হ্যাঁ, পেয়েছি,' জনসন জবাব দিলেন। 'চার-চারটা বছর অমানুষিক পরিশ্রমও করেছি আমি। বখরার জন্য যদি এসে থাকো, ভুলে যাও। একটা কানাকড়িও পাবে না আমার কাছ থেকে।'

'আহা, রাগ করছেন কেন?' কোয়ান বলল।

'মুফতে নিতে আসিনি আমরা,' নীল বলল। 'ভাবছিলাম, লোক দরকার হতে পারে আপনাদের। সাহায্যের দরকার হবে।'

'যে কোনো কাজ করে দিতে রাজি আছি আমরা, ক্যাপ্টেন,' কোয়ান বলল। 'ঘর মোছা, বাথরুম সাফ, কোন কাজেই আপত্তি নেই আমাদের।' বাথরুম সাফ করার কথা বলে যেন কী এক সাংঘাতিক রসিকতা করে ফেলেছে, তাই নিজের রসিকতায় নিজেই কর্কশ হাসিতে ফেটে পড়ল সে।

'সরি,' হাসি তো পেলই না জনসনের, রাগে ফেটে পড়লেন। 'মেথর দরকার নেই আমার। ভাগো। বিদেয় হও।'

'তাই নাকি,' খোঁচা খোঁচা দাড়িভর্তি গাল চুলকাল নীল।

খিকখিক করে নির্লজ্জের মত হাসল। বলল, 'তারমানে লোক যাতে দরকার হয় সেই ব্যবস্থাই করতে হচ্ছে। এমন যদি হয়, আপনার দুজন কর্মী দুর্ঘটনায় অকেজো হয়ে গেল, তখন কী করবেন? বাড়তি লোকের দরকার না হোক, ওই দুজনের জায়গা তো পূরণ করবেন?'

'আমাকে হুমকি দিয়ে লাভ নেই। আমার কোনো লোকের গায়ে হাত দিয়ে দেখো না, কি অবস্থা করি!' শীতল কণ্ঠে জবাব দিলেন জনসন। 'হাঙর দিয়ে না খাইয়েছি তো আমার নাম জনসন না। ভাগো এখন! যাও!'

'মিছিমিছি রাগ করছেন আপনি, ক্যাপ্টেন,' মনে মনে রেগে কাঁই হলেও মুখে সেটা প্রকাশ করল না কোয়ান। 'হাঙর দিয়ে খাওয়ানো লাগবে না আমাদের। শত্রুতা করতে আসিনি আমরা। বরং বন্ধু ভাবতে পারেন।'

'আমি বলছি ভাগো!' গর্জন করে উঠলেন জনসন।

'এটা খোলা সমুদ্র,' শান্ত থাকল না আর নীল, সমান তেজে চেঁচিয়ে উঠল। 'কারও বাপের সম্পত্তি না। এখানে আমাদের যতক্ষণ ইচ্ছে থাকব। যখন ইচ্ছে হয়, যাব।'

'হ্যাঁ, এই এলাকা এখন বাপের সম্পত্তি না হলেও আমার সম্পত্তি। সেইন্ট লুসিয়ান সরকারের কাছ থেকে বৈধভাবে লিজ নিয়েছি। তোমরাই বরং জোর খাটাচ্ছ। ভাল কথায় যাবে না তো। দাঁড়াও, যাওয়ানোর ব্যবস্থা করছি।'

অ্যান্থনির দিকে তাকালেন জনসন। চোখের ইশারা করলেন।

এই ইঙ্গিতটার অপেক্ষাতেই ছিল অ্যান্থনি। মুহূর্তে রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিল। ট্রিগার টিপল। ঠাস করে গুলি ফোটার শব্দ হলো। বুলেটটা কারও কোনো ক্ষতি না করে দুই দস্যুর মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। আবার ট্রিগার টিপল অ্যান্থনি। আবার গুলি চলে গেল

দুজনের মাথার ওপর দিয়ে।

'থাক থাক, আর ভয় দেখানো লাগবে না,' অ্যান্থনি তৃতীয়বার ট্রিগার টেপার আগেই চিৎকার করে উঠল নীল। মাথা নিচু করে ফেলেছে। 'চলে যাচ্ছি এখন। তবে, মনে রাখবেন, ক্যাপ্টেন, আবার আসব আমরা।'

'হ্যাঁ,' সুর মেলাল কোয়ান। 'খুব শীঘ্রি আবার আমাদের দেখা পাবেন।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল দুই দস্যু।

বোট ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

'ভালই দেখালে, অ্যান্থনি,' জনসন বললেন। 'এখন থেকে তোমাকে আর নুশানকে আরও সাবধান হতে হবে। হাসিমুখে গেলেও মনে আগুন জ্বলছে ওই হায়েনাগুলোর। কী যে করবে ওরা কিছুই বলা যায় না।'

'ভয় নেই, স্কিপার,' অ্যান্থনি বলল। 'ওরাও দুজন, আমরাও দুজন, কিছুই করতে পারবে না আমাদের।'

চলে গেল দুই চাচাতো ভাই। টপ ডেকে নিজ নিজ জায়গায় গিয়ে অবস্থান নিল।

'নুশান আর অ্যান্থনি,' জনসন বললেন, 'পৃথিবীতে একটা জিনিস ছাড়া আর কোনো কিছুকে ভয় পায় না।'

কৌতূহল হলো অনিকের। জানতে চাইল, 'সেই জিনিসটা কী?'

চোখ ধাঁধানো রোদে নীল আর কোয়ানের বোটটাকে ঝিলমিল করতে দেখল অনিক। দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশ।

'ভূত,' জনসন জবাব দিলেন। 'একমাত্র ভূতকে ভয় পায় অ্যান্থনি আর নুশান। এখানকার সমুদ্রের পানিতে নাকি ঘুরে বেড়ায় ভূতটা।'

'মনিকা!' আবীর বলল।

'হ্যাঁ, মনিকা,' জনসন বললেন। আনমনে নিজের গলায় ঝোলানো মোহরটা নাড়াচাড়া করছেন। 'এক রাতে নুশান আর অ্যান্থনি ভূতটাকে দেখেছেও। ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিল ওরা। আমি ভূত বিশ্বাস করি না। কিন্তু এদ্বীপের বেশির ভাগ মানুষই কুসংস্কারে বিশ্বাসী, ভূতের ভয়ে কাবু।'

একের পর এক ভূতের গল্প শোনাতে লাগলেন জনসন। তাঁর নাবিক জীবনের গল্প। বেশ রসিয়ে রসিয়ে গুছিয়ে বলতে পারেন। শ্রোতা ধরে রাখার ওস্তাদ। কিন্তু আধঘণ্টা পরেই এল বাধা। মরগান এসে হাজির হলো কাজের কথা বলতে। কথা বলতে বলতে চলে গেল জনসনকে নিয়ে।

একা হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা। আবীর জিজ্ঞেস করল, 'মারজি সম্পর্কে কী জেনে এলি?'

খাড়া দুপুর। কড়া রোদ পড়ছে এখন ডেকের ওপর। রোদের দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করতে করতে অনিক জানাল, 'ওর পুরো নাম মারজি পিটম্যান। কারিনার রুমমেট।'

'ইনটারেস্টিং,' লম্বা চুলে আঙুল চালাল আবীর। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'চুরি করা জিনিসগুলো? কী করেছে?'

'আমার ধারণা, নিজের কাপড়ের ব্যাগটায় চালান করে দিয়েছে।

'হুঁ!' আনমনে নিজেকেই যেন বলল আবীর। 'তারমানে মারজি আজকে প্রথম চুরি করেনি। আগেও করেছে। জিনিসগুলো বাড়ি নিয়ে গেছে। কারিনা দেখে প্রতিবাদ করেছে। আর এই ঘটনা থেকেই ঝগড়ার সূত্রপাত। তখন কারিনার ওপর হামলা চালিয়েছে সে। হতে পারে না এরকম?'

'পারে,' মাথা ঝাঁকাল অনিক। 'তা তুই এতক্ষণ কী করলি?'

'ম্যাসনের সঙ্গে কথা বলেছি,' আবীর জানাল।

'তিনি কী বললেন?'

'তেমন কিছু না,' আবীর বলল। 'জানালেন, কলার ব্যাবসা করেন। আমাদের জাহাজে ওঠাটা তাঁর মোটেও পছন্দ না। আমরা জখম হতে পারি, এমনকি মারাও যেতে পারি বলে হুমকি দিলেন। কারিনার কথা জিজ্ঞেস করিনি। করার সুযোগও দেননি। মেজাজ ভয়ানক খারাপ হয়ে আছে তাঁর।'

'তুই যখন রীফ দেখতে গেলি, বসে বসে ভাবার সুযোগ পেয়েছি আমি,' অনিক জানাল। 'কারিনাকে যে খুন করতে চেয়েছে, তার বিশ্বাস, পানিতে ডুবে মারা গেছে কারিনা। এখন থেকে জাহাজে যার সঙ্গেই ওর ব্যাপারে কথা বলব, তার মুখে অপরাধের চিহ্ন আছে কিনা দেখে বোঝার চেষ্টা করব। হয়তো এভাবেই ধরা যাবে খুনীকে। অপরাধবোধের কারণেই হয়তো ম্যাসনের মেজাজ এত খারাপ হয়ে আছে।'

'মনে রাখব কথাটা,' আবীর বলল। 'তবে আরেকটা কথাও মনে রাখতে হবে আমাদের, সব অপরাধীর মুখে অপরাধের ছাপ প্রকাশ পায় না।'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল অনিক।

মরগানকে আসতে দেখল সে। অদ্ভুত একটা জিনিস দিয়ে নখ পরিষ্কার করছে। স্পিয়ারগানে ব্যবহার করার ছোট আকারের একটা বর্শা। সেটার চোখা মাথা দিয়ে নখের ভিতর থেকে খুঁচিয়ে ময়লা বের করছে। কাছে এসে রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'তোমরা ছেলেরা মনে হচ্ছে এই অভিযানের ব্যাপারে খুব আগ্রহী?'

'আগ্রহী হওয়ার মতই তো ব্যাপার, তাই না?' প্রশ্ন দিয়ে প্রশ্নের জবাব দিল অনিক।

'তা ঠিক।' অনিকের দিক থেকে আবীরের দিকে নজর ফিরাল

মরগান। 'তবে হঠাৎ একআধ দিন এলে ভালই লাগে, তোমাদের যেমন লাগছে। রোজ রোজ এলে আর লাগে না। তার ওপর যদি আমাদের মত কাজ করতে হয়। ডেকে দাঁড়িয়ে অনবরত ঘামা, ভারি ভারি যন্ত্রপাতি তোলা, পানিতে ডুব দিয়ে বালি হাতড়ে বেড়ানো, সাংঘাতিক একঘেয়ে আর পরিশ্রমের কাজ। একেক সময় হাঁপ ধরে যায়। মনে হয়, ধূর, ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে চলে যাই!'

জনসনকে আসতে দেখা গেল। হাতে পানি ভর্তি একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ। ভিতরে একটা প্রাচীন জুতো। জুতোটা সাগরের নিচে আগেই দেখে এসেছে আবীর।

'পানি দিয়ে রেখেছেন কেন?' জানতে চাইল অনিক।

'এভাবেই রাখার নিয়ম,' জনসন জানালেন। 'নইলে ভেঙে যায়। পানির নিচ থেকে তুলে আনা এধরনের ভঙ্গুর জিনিসগুলোকে খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়।'

মারজির চুরি করে লুকিয়ে রাখা জিনিসগুলোর কথা মনে পড়ল অনিকের। ওগুলোও কি এভাবেই পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে? রেস্ট রুমে অনেকটা সময় কাটিয়েছে মারজি। নিশ্চয় পানিতে লবণ গুলে তার মধ্যে চুরি করা জিনিসগুলো ভিজিয়ে রেখেছে। সেকারণেই বেরোতে অত দেরি করেছে সে।

'এযাবৎ যত জিনিস পেয়েছি আমরা,' পানি ভর্তি ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে জনসন বললেন, 'তার মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে দামী এই জুতোটা। এর অ্যানটিক মূল্যের কোনো তুলনা হয় না। সোনা, রূপা, অলঙ্কার আর এই জুতো, সব একসাথে রেখে যদি জিজ্ঞেস করো কোনটা নেব, আমি এই ভঙ্গুর পুরানো বাতিল চামড়ার টুকরোটাই বেছে নেব।'

বর্শার মাথা দিয়ে এখনও নখ পরিষ্কার করছে মরগান। 'কিন্তু

আমি নেব না। আমার মাথায় অত ছিট নেই। আমার পছন্দ ধনরত্ন, সোনার মোহর, গহনা...।' তিক্তহাসি হাসল সে। 'কিন্তু পাচ্ছি কোথায় নেয়ার জন্য?'

একটা মুহূর্ত চুপ করে সাগরের দিকে তাকিয়ে রইল মরগান। তারপর বর্শার মাথাটা তুলল অনিকের দিকে। মুখ সরিয়ে নিল অনিক। হেসে ফেলল মরগান। 'তুমি ভেবেছ চোখে খোঁচা মারব?' আলতো করে অনিকের কাঁধে টোকা দিল বর্শার মাথা দিয়ে। 'চলি।'

চলে গেল মরগান।

'জুতোটা এত পছন্দ কেন আপনার?' জনসনকে জিজ্ঞেস করল আবীর।

'এটার দিকে তাকালেই যেন পুরানো সেই জলদস্যুদের সময়টা দেখতে পাই,' উত্তেজিত মনে হচ্ছে জনসনকে। 'দেখতে পাই সেই মানুষটাকে, যে এটা পরতো। রোদে পোড়া চামড়া। অনবরত দড়ি টানাটানি করার ফলে ক্ষতবিক্ষত আঙুল। সারা শরীরে কাটাকুটির দাগ, অসংখ্য লড়াইয়ের চিহ্ন। আমি ধরে নিচ্ছি ওর নাম ব্রোগান।'

'জলদস্যুদের প্রতি আপনার একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে, তাই না?' জনসনের কথায় অভিভূত হয়ে গেছে অনিক।

'হ্যাঁ, আছে, সত্যিই আছে,' স্বীকার করলেন জনসন। 'শুধু যে জলদস্যুদের গুপ্তধনের লোভে মারমেড প্রিন্সেসকে আমি খুঁজে বেরিয়েছি, মোটেও তা নয়। ওই জাহাজটার প্রতিও আমার অদ্ভুত এক আগ্রহ, এক ধরনের তীব্র আকর্ষণ জন্মে গেছে। আগ্রহী হয়ে উঠেছি ওটার ক্যাপ্টেন জলদস্যুদের সর্দার ক্যাপ্টেন রেড বিয়ার্ডের প্রতি।'

'কেমন ছিল রেড বিয়ার্ড, জানেন?' জানতে চাইল অনিক।

'ভয়ঙ্কর লোক, যার বুদ্ধি ছিল, বিচক্ষণতা ছিল,' এমন ভঙ্গিতে

বলতে লাগলেন জনসন, যেন ব্যক্তিগতভাবে চেনেন ওই জলদস্যুকে। 'ব্রিটিশ নেভির অফিসার ছিল সে। তারপর দস্যুতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়। দীর্ঘ চারটি বছর–যখন থেকে জাহাজটাকে খোঁজা শুরু করেছি, কী কঠিন এক সময়ের মধ্য দিয়ে পার হতে হয়েছে আমাকে। পরিশ্রমে আর হতাশায় মাঝে মাঝে ভেঙে পড়তাম আমি। কিন্তু যতবারই এমন হয়েছে, প্রতিবারেই অন্ধকার গভীর রাতে এসে আমার সঙ্গে কথা বলত রেড বিয়ার্ড। আমাকে উৎসাহ জোগাত।'

'কীভাবে?' জনসনের কথার ভঙ্গি নাড়া দিয়েছে আবীরকে।

'আমার ডাকনাম ধরে বলত, চালিয়ে যাও, ইমবি, থেমো না,' কণ্ঠস্বর প্রায় ফিসফিসে করে তুলে জনসন বললেন, 'একমাত্র তুমিই পারবে আমার মারমেড প্রিন্সেসকে খুঁজে বের করতে। আমি জানি, তুমি পারবে।'

'আপনি তখন বললেন, আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন না,' অবাক লাগছে অনিকের।

'কী জানি!' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জবাব দিলেন জনসন। 'হয়তো ভুল বলেছি। একটু একটু করি। নইলে শুনতাম কীভাবে কয়েকশো বছর আগে মরে যাওয়া রেড বিয়ার্ডের কণ্ঠস্বর?'

'সেটা আপনার কল্পনা। রেড বিয়ার্ডের নাম করে আপনি নিজেই নিজের সঙ্গে কথা বলতেন, নিজেকে উৎসাহ দিতেন, মনের শক্তি জোগাতেন।'

'কী জানি! হবে হয়তো!'

আরও ঘণ্টা দুয়েক হোয়াইট সোয়ানে থাকল অনিক-আবীর। সুযোগ পেল জাহাজের সবার সঙ্গে কথা বলার। জনসন, ম্যাসন, মরগান, মারজি, ডিক, টম, ব্রডি, রোজার, গ্রেগ, অ্যান্থনি, নুশান এবং আর্কিওলজিস্ট রডরিক। ম্যাসন আর মারজি বাদে সন্দেহ করার মত

আর কাউকে পেল না ওরা। ক্যাপ্টেন জনসনকে ধন্যবাদ দিয়ে অবশেষে জাহাজ থেকে নেমে এল। নিজেদের নৌকায় উঠল।

বাঁধন খুলল আবীর। ইঞ্জিনের কর্ড ধরে টানতেই গর্জন করে চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন। ক্যারিবিয়ান সাগরের গভীর নীল জলরাশি ভেদ করে দ্রুত ছুটে চলল ওদের নৌকা। আকাশে কয়েক টুকরো খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ জমেছে। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই আপাতত।

মিনিট দশেক পর এমন একটা শব্দ কানে এল ওদের, যেটা বজ্রের হুঙ্কারের চেয়ে কোনো অংশে কম আশঙ্কাজনক নয়। পাওয়ারবোটের ইঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে শোনা গেল কর্কশ মিশ্র অট্টহাসির শব্দ।

ওদের দিকে ছুটে আসছে নীল আর কোয়ান। পেছনে রেখে আসছে প্রপেলারের সৃষ্ট লম্বা সাদা একটা ফেনার রেখা আর বড় বড় ঢেউ।

'আমাদের পিছনে লাগল নাকি?' জোরে জোরে নিজেকেই প্রশ্ন করল যেন গলুইয়ের কাছে বসা আবীর।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' উদ্বিগ্ন হলো আবীর।

'আহয়!' হাত নেড়ে চিৎকার করে উঠল নীল।

'চলতে থাক,' অনিক বলল। 'থামবি না।'

'আহয়!' আবার চিৎকার করে উঠল নীল। দ্রুত আবীরদের নৌকার কাছে চলে আসছে দস্যুদের বোট।

বাদামী রঙের একটা বোতল হাতে নিল কোয়ান। বোতলের মুখের কাছে কী যেন ধরল সে।

'কী করছে...' বলতে গিয়ে থেমে গেল আবীর।

হাত ঘুরিয়ে বোতলটা ছুঁড়ে মারল কোয়ান। অনিকদের নৌকার কয়েক গজ দূরে শূন্যে বিস্ফোরিত হলো ওটা। চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেল

কাঁচের টুকরো।

হা-হা করে হেসে উঠল নীল আর কোয়ান।

'বোমা মারছে আমাদের!' চিৎকার করে উঠল আবীর। 'বোতল-বোমা!'

অনিক বলল। 'আমার ধারণা, এরকম বোমা ওদের কাছে আরও আছে।'

তার কথা সত্যি প্রমাণ করতেই যেন আরও দুটো বোতল তুলে নিল দুই দস্যু।

'কী করব?' অনিককে জিজ্ঞেস করল আবীর। 'ওই বোমার একটাও যদি আমাদের নৌকায় এসে পড়ে, আমরা শেষ।'

হাত ঘুরিয়ে বোমা দুটো অনিকদের নৌকা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল নীল আর কোয়ান। অনিক বুঝে গেছে, মহাবিপদে পড়তে যাচ্ছে ওরা।

মোঃ শাওন হোসেন রাজু স স্ক্যান

আট

'ঘোরা! ঘুরিয়ে দে!' চিৎকার করে উঠল অনিক।

এক ঝটকায় আউটবোর্ড মোটরের হাতলটা ঘুরিয়ে দিল আবীর। ঝাঁকি দিয়ে ডানে ঘুরে গেল বোটের নাক। বাঁ দিকে বিস্ফোরিত হলো বোতল দুটো। কাঁচের গুঁড়ো বৃষ্টির মত এসে পড়ল নৌকার ভিতর।

'এই, তোর গায়ে লেগেছে?' আবীরকে জিজ্ঞেস করল অনিক।

'না।'

আরও এগিয়ে এল পাওয়ারবোট। নৌকার কাছ ঘেঁষে এল।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল নীল, নৌকার গতির সঙ্গে তাল রাখার জন্য। পাওয়ার বোটে এক ঝুড়ি বাদামী বোতল চোখে পড়ল অনিকের। নীলের প্যান্টের কোমরে পিস্তল গোঁজা আছে তা-ও দেখতে পেল।

'কই যাও ছানারা?' ব্যঙ্গের সুরে কথা বলল নীল। 'এত তাড়াতাড়ি কিসের? পার্টিটা তো মাত্র শুরু।'

'কার পার্টি?' রুক্ষ স্বরে জবাব দিল আবীর। 'নিজেদের চরকায় তেল না দিয়ে অন্যের পিছনে লাগতে আসেন কেন?'

আবীরের মত গোঁয়ার্তুমি করল না অনিক। পালাতে পারলে ভাল হতো, বুঝতে পারছে। কিন্তু পাওয়ারবোটের সঙ্গে পারবে না। চারপাশে তাকাল। সাহায্য করার মত কোনো বোট কিংবা জাহাজ চোখে পড়ল না। মাইলের পর মাইল শুধুই পানি আর পানি।

'ক্যাপ্টেন রেড বিয়ার্ডের নাবিকদের দলে যোগ দিতে চাও?' নৌকার গা ঘেঁষে বোট ঠেসে ধরে রেখে হাসতে হাসতে বলল নীল। 'চাইলে পাঠিয়ে দিতে পারি ওদের কাছে। পানির নিচে গিয়ে চিরকাল ওদের সঙ্গী হয়ে মহা আনন্দে দিন কাটাবে।' হাসল সে। পরক্ষণে মুখ থেকে হাসি মুছে ফেলে সিরিয়াস হয়ে গেল। বলল, 'ক্যাপ্টেন জনসনের লোক তোমরা, তাই না?'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল অনিক। 'জাহাজে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আজকেই প্রথম।'

'সত্যি বলছ?' বিশ্বাস করছে না কোয়ান। 'তোমাদের দেখে কিন্তু ওই জাহাজের লোক বলেই মনে হয়েছে।'

'মনে হয়েছে মানে কী? ওই জাহাজেই কাজ করে ওরা। ক্যাপ্টেনের কাছে কেমন করে দাঁড়িয়েছিল, দেখিসনি। আমাদের ফাঁকি দিতে এখন মিথ্যে বলছে।'

'হুঁ!'

'তোমাদের এখন বিদেয় করতে পারলে, দুজন লোক কম পড়ে যাবে ক্যাপ্টেন জনসনের,' নীল বলল। 'বাধ্য হয়ে লোক খুঁজবে। তাদের জায়গায় আমরা ঢুকে পড়ব তখন।'

'সেই স্বপ্নই দেখতে থাকুন,' গোঁয়ারের মত বলল আবীর। 'আর যাকেই নেন, দুই মড়িখেকোকে নেবেন না ক্যাপ্টেন।'

'মড়িখেকো!' জ্বলে উঠল নীলের চোখ।

'আহ্, তুই থাম তো আবীর!' তাড়াতাড়ি বলল অনিক। 'দেখুন, জনসনের লোক নই আমরা। বিশ্বাস করুন।'

বিশ্বাস করল না নীল। কোয়ানের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল। ঝুড়ি থেকে একটা বোতল তুলে নিল সে।

কোয়ানও একটা বোতল তুলে নিল। চোখে কুটিল হাসি।

'ওরা মিছে কথা বলছে, তাই না, কোয়ান?' দাঁত বের করে হাসল নীল।

'মিথ্যে বলা মহাপাপ। সেজন্য শাস্তি পেতে হবে ওদের।'

'নিশ্চয়ই। পাপ করলে সাজা পাওয়াটাই নিয়ম।'

আতঙ্কিত হয়ে অনিক দেখছে, লাইটার জ্বেলে বোতলের মুখের সলতেতে আগুন ধরাচ্ছে দুই দস্যু। ঝটকা দিয়ে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিল আবীর। সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু অনিক জানে, লাভ নেই। পালানোর কোন পথ খোলা নেই ওদের জন্য।

কয়েক সেকেন্ড বোতল দুটো উঁচু করে ধরে রাখল দুই দস্যু। সলতেতে ভালমত আগুন লাগার সময় দিচ্ছে। যাতে ছুঁড়ে মারার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হয়।

কোয়ানরা বোতল ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবীরের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল অনিক। 'ঘোরা! ঘুরিয়ে ফেল!'

ঝটকা দিয়ে নৌকার নাক ঘুরিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল

আবীর। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। বোতল দুটো এসে পড়েছে ততক্ষণে নৌকার মধ্যে। একটা বোতল পড়েছে ঠিক তার পায়ের কাছে। তুলে নিয়ে ফেলে দেয়ার জন্য হাত বাড়াল সে। কিন্তু সলতের আগুন বোতলের মুখ ছুঁয়ে ভিতরে চলে গেছে।

'সরে যা, সরে যা!' আবার চেঁচিয়ে উঠল অনিক।

নৌকার সামনের দিকে ছুটল আবীর। অল্পের জন্য বাঁচল। গলুইয়ের কাছে পৌঁছেছে সে, ঠিক এই সময় ফাটল বোমা দুটো। প্রচণ্ড শব্দ কানে ঝিঁ-ঝিঁ ধরিয়ে দিল।

'বিদায়!' ওদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল নীল।

সঙ্গীর সুরে সুর মিলিয়ে কোয়ান বলল, 'চির বিদায়!'

উন্মাদের হাসি হাসতে হাসতে বোটের নাক ঘুরিয়ে নিল দুই দস্যু। পিছনে সাদা ফেনার রেখা সৃষ্টি করে ওদের পাওয়ারবোট দ্রুত সরে যেতে লাগল নৌকার কাছ থেকে। বড় বড় ঢেউ উঠল। ভীষণভাবে দুলতে শুরু করল অনিক-আবীরের নৌকাটা।

বোমার বিস্ফোরণে কাঁচের টুকরো লেগে সাধারণ কয়েকটা কাটাকুটি বাদে আর বড় কোন ক্ষতি হয়নি ওদের। কিন্তু নৌকাটা রেহাই পায়নি, ওটার মস্ত ক্ষতি হয়ে গেছে।

'ভাল বিপদে পড়েছি কিন্তু,' নৌকার তলায় দুটো বড় বড় ফাটল দেখিয়ে বলল অনিক। গলগল করে পানি উঠছে সেখান দিয়ে।

'সেচা শুরু করব নাকি?' আবীরের প্রশ্ন।

'লাভ হবে না। যে হারে উঠছে, সেচে কুলাতে পারব না।' বাংলো থেকে নিয়ে আসা কাঠের একটা সাপ্লাই বক্স খুলল অনিক। একটা ফ্লেয়ার গান আর দুটো ফ্লেয়ার বের করল।

গোড়ালি পর্যন্ত পানি উঠে গেছে। ছোট পিস্তলটায় একটা ফ্লেয়ার ভরল সে। পিস্তলের নল ওপরের দিকে করে টিপে দিল ট্রিগার। শিস

কেটে আকাশে উঠে গেল সিলিন্ডারের মত জিনিসটা। পেছনে রেখে গেল লাল ধোঁয়ার রেখা। আশা, এই ধোঁয়া কোন জলযানের চোখে পড়লে বাঁচাতে আসবে ওদের।

'কেউ আসে না কেন?' দিগন্তের দিকে আকুল নয়নে তাকিয়ে থেকে বলল আবীর। কোন জাহাজ কিংবা বোটের চিহ্নও নেই।

একটু আগের কালো মেঘের টুকরোগুলো বড় হয়েছে আরও। সেদিকে তাকিয়ে আছে অনিক। 'আকাশে মেঘ তো, তাই মেঘের জন্য দেখতে পায়নি হয়তো।'

দিগন্তের দিকে নীরবে তাকিয়ে থেকে আরও কয়েকটা মিনিট কাটাল ওরা। আশা করল, কোন না কোন বোট ফ্লেয়ারের লাল ধোঁয়া দেখতে পেয়ে উদ্ধার করতে আসবে। উত্তেজনায় ভরা একেকটি মুহূর্তকে লাগছে একেকটি ঘণ্টার মত। নৌকার পিছন দিকটা প্রায় পুরোটাই ডুবে গেছে। আর অপেক্ষা না করে দ্বিতীয় এবং শেষ ফ্লেয়ারটা ছুঁড়ল অনিক।

সামনের দিকও পানিতে ভরে যাচ্ছে। আর থাকা যাবে না নৌকায়। অনিক বলল, 'ঝাঁপ দে।'

ঝাঁপ দিল আবীর। তার পিছন পিছন অনিকও পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোখের সামনে নৌকাটাকে ডুবে যেতে দেখছে। পানিতে ভেসে আছে দুজনে। লাইফ জ্যাকেট পরা। আর কোনো উপায় না দেখে সেইন্ট লুইসের দিকে সাঁতরানো শুরু করল।

পনেরো মিনিট পর বিশ্রাম নিতে থামল। ভেসে রইল চিত হয়ে। চারপাশে তাকিয়ে দেখল অনিক। একটা সীগাল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। তারপর হঠাৎ করেই চোখে পড়ল ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা।

'আতঙ্কিত হবি না আগেই বলে দিচ্ছি,' আবীরকে সাবধান করল সে। 'কয়েকটা হাঙর দেখতে পাচ্ছি। আমাদের দিকেই আসছে।'

ফিরে তাকাল আবীর। চোখে পড়ল হাঙরের পিঠের ত্রিকোণ পাখনা। তিনটা হাঙরের পাখনা দেখতে পেল। 'না, হব না। কিছুক্ষণ আগে আরেকটা হাঙরের মুখোমুখি হয়েছিলাম, রীফ দেখতে গিয়েছিলাম যখন। আমাকে কিছু করেনি ওটা।'

'এগুলোও যে করবে না, তার কোনো গ্যারান্টি নেই।' স্তব্ধ হয়ে গেল অনিক। 'আরে, এ কী!'

'সর্বনাশ!' আবীরও দেখে ভয় পেয়ে গেল।

পরিষ্কার পানিতে রক্তের চিহ্ন। কোথা থেকে এসেছে বুঝতে দেরি হলো না। অনিক বলল, 'আমার পায়ের কাটাটা থেকে বেরোচ্ছে। পানিতে-সাঁতরানোর সময় ব্যান্ডেজ খুলে গেছে। রক্ত বেরোচ্ছে এখন।'

এমনিতে সাধারণ অবস্থায় মানুষের জন্য ততটা বিপজ্জনক না হলেও রক্তের গন্ধে পাগল হয়ে ওঠে হাঙর। তখন মানুষ না অন্য জানোয়ার, বাছবিচার করে না। বহু দূর থেকেও রক্তের গন্ধ পেয়ে ছুটে আসে হাঙর।

'ওই দেখ!' আবীর বলল।

পানিতে এখন তিনটার জায়গায় আরও অনেকগুলো হাঙরের পাখনা ভেসে উঠেছে। ডজনখানেকের কম হবে না। খুব বেশি দূরে নেই ওরা। চার পাঁচশো গজ হবে। এই দূরত্ব কিছুই না হাঙরের জন্য। চোখের পলকে কাছে চলে আসবে।

'দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে!' হতাশায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অনিক।

'পরিস্থিতি কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না আমার,' শান্ত থাকার চেষ্টা করছে আবীর। 'ওগুলোকে ঠেকানো...'

'আস্তে! একটা শব্দ শুনলাম মনে হলো?'

'কিসের শব্দ?' চারপাশে তাকাতে লাগল আবীর।

ওপরের দিকে তাকাতে মেঘের ভিতরে রূপালী একটা ঝিলিক চোখে পড়ল তার। ঢুকে গেল মেঘের ভিতর। আবার বেরিয়ে এল। একটা অ্যারোপ্লেন। নাক নিচু করে ফেলেছে। সোজা উড়ে আসছে ওদের দিকে।

'আমাদের দেখেছে!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল অনিক। 'আমাদের নিতে আসছে!'

'তাড়াতাড়ি করে না কেন?' হাঙরগুলোর দিকে তাকাল আবীর। সত্তর গজ দূরেও নেই আর।

কাছে এসে গেল প্লেনটা। পানির একেবারে ওপর দিয়ে উড়ছে। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পাশের একটা দরজা। এমুহূর্তে অনিক-আবীরের জন্য সবচেয়ে সুখকর দৃশ্য। জানালা দিয়ে যখন কাত হয়ে এল একটা মুখ, দেখে বিশ্বাস হতে চাইল না ওদের।

হিপো!

'এই অবস্থা তোদের!' ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠল হিপো। 'কীভাবে এখানে এলি পরে জিজ্ঞেস করব। এই নে, দড়ি!'

ওদের দিকে একটা দড়ি ছুঁড়ে দিল হিপো। দড়ির মাথাটা অনিক-আবীরের সামনে পড়ে ছুটতে শুরু করল প্লেনের সঙ্গে।

'ধরছিস না কেন?' চেঁচিয়ে অনিককে বলল আবীর। হাঙরগুলোর দিকে তাকাল। পঞ্চাশ গজ দূরে এখন।

'তুই আগে যা,' অনিক বলল।

'আহ্, তর্ক করিস না তো! তোর পা কাটা। রক্ত বেরোচ্ছে। গন্ধ ছড়াচ্ছিস। হাঙরগুলো এসে প্রথম কামড়টাই তোর পায়ে বসাবে। আমাকেও ছাড়বে না।'

আর তর্ক করল না অনিক। দড়িটা ধরার জন্য থাবা মারল। কিন্তু

ফসকে গেল। দড়িটাকে দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে প্লেন। উদ্ধারকাজে প্লেনের চেয়ে হেলিকপ্টার অনেক বেশি সুবিধাজনক। হেলিকপ্টার এক জায়গায় স্থির থাকতে পারে, প্লেন পারে না। দড়িটা সরে গেছে। ওটা ফিরে আসার অপেক্ষায় ভেসে থাকা ছাড়া গতি নেই।

প্লেনটাকে ঘুরানো শুরু করেছে হিপো।

ভারি দম নিল আবীর। হাঙরগুলোর পৌঁছতে আর মিনিটখানেকের বেশি লাগবে না। করাতের মত ত্রিকোণ দাঁতগুলো ওকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করছে—বার বার কল্পনায় আসতে চাইছে, কিন্তু জোর করে সেসব ভাবনা মন থেকে তাড়াল সে।

প্লেন নিয়ে ফিরে এল হিপো। প্লেনের নাক নিচু করাল। দড়িটা নিয়ে এল অনিক-আবীরের মাঝখানে। আবার থাবা মারল অনিক। আবার মিস করল। আবারও দড়িটা ফিরে এল ওদের কাছে। ডাইভ দিয়ে ধরতে গেল অনিক। আর মিস করল না।

দড়ি আঁকড়ে ধরে আছে সে। প্লেনের সঙ্গে সঙ্গে দড়িটা ওকে টেনে নিয়ে চলেছে। প্লেন চক্কর মারছে। সে-ও চক্কর মারছে। আবীরের কাছে দ্রুত ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে দড়িটা। দড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল অনিক।

হাঙরগুলোর দিকে ফিরে তাকাল আবীর। শুধু পিঠের পাখনা না, কাঁচের মত স্বচ্ছ পানিতে ওগুলোর নীলচে ধূসর চকচকে দেহগুলোও দেখতে পাচ্ছে এখন। এগিয়ে আসছে। কাছে। আরও কাছে। বড়জোর আর তিরিশ সেকেন্ড। তারপরই এসে ওর দেহে কামড় বসাবে ওগুলো।

প্লেনের দিকে ফিরল আবীর। ফিরে আসছে প্লেনটা। দড়ি বেয়ে অর্ধেক উঠে গেছে অনিক। দড়িতে ঝুলছে। টপ টপ করে রক্তের ফোঁটা পড়ছে ওর পায়ের জখম থেকে। হাঙরের দিকে ফিরল না আর

আবীর। জানে, ওগুলো কয়েক গজের বেশি দূরে নেই আর এখন।

ওপর দিকে তাকিয়ে আবীর দেখল, স্থির থাকছে না দড়িটা, বিপজ্জনক ভঙ্গিতে দুলছে অনিককে নিয়ে। আবীর জানে, মাত্র একটা সুযোগ পাবে সে। মিস করলে শেষ। এগিয়ে আসছে দড়ি। যতটা সম্ভব কাছে আনার চেষ্টা করবে হিপো, বুঝতে পারছে আবীর। দড়ির মাথাটার দিকে সমস্ত মনোযোগ একত্রিত করল সে।

হাঙরের কথা ভুলে যাও, নিজেকে বোঝাল। কাছে এলেই ঝাঁপ দেবে। দড়ি ধরবে। ধরো...ধরো...ধরো...

দড়িটা পাশ দিয়ে যাবার সময় ডাইভ দিল সে। একই সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে। থাবা মারল এক হাতে। পরক্ষণে অন্য হাতে।

ভাগ্য ভাল, ফসকাল না।

'উঠে আয়!' চিৎকার করে বলল অনিক।

নাক উঁচু করে ফেলেছে প্লেন। পানি থেকে ওপরে তুলে ফেলছে আবীরকে। হাঙরগুলো পৌঁছে গেছে তার পায়ের কাছে। তবে কামড় বসানোর আগেই পানি ত্যাগ করল আবীরের পা।

খসখসে দড়িটাকে দুই হাতে চেপে ধরে নিচে তাকাল আবীর। ত্রিকোণ পাখনাগুলোকে পাগলের মত ঘুরতে দেখল রক্তের ফোঁটাকে ঘিরে। ভেবে নিশ্চয় অবাক হচ্ছে হাঙরগুলো, কে ওদের খাবার ছিনিয়ে নিয়ে গেল?

ধীরে ধীরে উড়ে চলেছে প্লেন। দড়ি বেয়ে কেবিনের দিকে উঠে যাচ্ছে অনিক-আবীর। ওদেরকে ভিতরে ঢুকতে সাহায্য করল হিপো। চার-সিটের বিমানটাতে সে এখন একা। একটা সিটের ধাতব পায়ায় দড়ির অন্য মাথা বাঁধা দেখতে পেল অনিক।

'ফ্লেয়ার চোখে পড়তেই সোজা এদিকে ছুটে এসেছি,' হিপো

জানাল। চালকের হুইল চেপে ধরেছে আবার।

'ভাগ্যিস এসেছিলি,' ক্লান্ত ভঙ্গিতে সিটে এলিয়ে পড়ে জবাব দিল আবীর।

'একটা অদ্ভুত কাণ্ড, বুঝলি?' হিপো বলল। 'কেন যেন আমার মনে হচ্ছিল, চাচার বোটটা গেছে।'

'ওটার জীবন এমনিতেও শেষ হয়ে এসেছিল,' বলল হিপোর পাশে বসা অনিক। 'ভয় নেই। কৈফিয়ত দিতে হবে না তাঁর কাছে তোকে। তোর চাচাকে আরেকটা নতুন বোট কিনে দেব আমরা।'

'খুব খুশি হবে তাহলে।' সেইন্ট লুসিয়ার দিকে প্লেনের নাক ঘুরাল হিপো।

যা যা ঘটেছে, ধীরে ধীরে ওকে বলতে লাগল অনিক-আবীর।

মাথা তুলে থাকা পিটন পর্বতের চূড়ার কাছে পৌঁছে গেল প্লেন। বিমান বন্দরের আকাশের ওপরে চক্কর দিতে দিতে হিপো বলল, 'এমন ভয়ঙ্কর সব কাণ্ড করিস তোরা, ভাবতে গেলেই খিদে পায় আমার। মনে হতে থাকে সব কিছু খেয়ে ফেলে প্রতিশোধ নিতে থাকি ওসব ঘটনার।'

হেসে ফেলল অনিক-আবীর।

*

সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ বাংলোতে ফিরে এল ছেলেরা। পুরানো লম্বা একটা কাউচে বসে কোকোনাট সোডা খাচ্ছে অনিক আর হিপো। আবীর রান্নাঘরে রাখা টেলিফোন সেট থেকে ফোন করছে। সোডা ভরা হয়েছে সেই একই রকম বাদামী বোতলে, যেগুলোর সাহায্যে বোমা বানিয়ে ছুঁড়েছিল নীল আর কোয়ান। ভাবনাটা আপাতত মগজ থেকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করল অনিক। নইলে রাগে মাথা গরম হয়ে যেতে চায়।

খালা আর মামাকে ফোন করে এলাম,' রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে আবীর জানাল। 'মামাকে সব কথা বলিনি, কিছু কিছু বলেছি। চিন্তা করতে মানা করেছি।'

'হ্যাঁ, আর লোক পেলি না, তোর মামা চিন্তা করতে গেছেন,' হিপো বলল। 'দেখ, কখন চলে আসেন তোদের কাজে সাহায্য করতে। তবে হ্যাঁ, লিলি খালা চিন্তা করবেন।'

'লিলি খালাকে জানাচ্ছে কে?' আবীরের দিকে তাকাল অনিক। 'ভার্জিনিয়ায় কারিনার বাবা-মা'র সঙ্গে কথা বলেছিস?'

'করেছি। তোর নিয়ে আসা তালিকাটায় কারিনার নামের পাশে আত্মীয়-স্বজনের নামের জায়গায় যে নামটা লেখা আছে সেটা কারিনার মায়ের নাম। মিসেস অ্যান্ডারসন যাতে সন্দেহ না করেন সেজন্য বললাম, আমি কারিনার বন্ধু, তাকে খুঁজছি। তিনি জানালেন, এক মাস হলো কারিনার সঙ্গে কথা হয় না তাঁর। কায়দা করে, যাতে তাঁর সন্দেহ না হয়, কারিনার ব্যাপারে কিছু খোঁজ-খবর নিলাম, কারিনা কোনো বিপদে আছে কিনা বোঝার জন্য। কিন্তু তিনি কিছু জানাতে পারলেন না।'

'তার মানে মিসেস অ্যান্ডারসন কিছুই জানেন না,' সামনে ঝুঁকল অনিক।

'খুব আন্তরিক মনে হলো মহিলাকে। তবে অচিরেই দুঃখ পেতে যাচ্ছেন তিনি,' আবীর বলল। 'যে কোনো সময় কারিনাকে ফোন করবেন তিনি। কিংবা হোয়াইট সোয়ান থেকেই তাঁকে ফোন করে জানানো হবে কারিনা নিখোঁজ...'

'কিন্তু তাঁকে সেটা জানতে দেয়া যাবে না,' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল অনিক। 'তার আগেই রহস্যটার সমাধান করে ফেলতে হবে আমাদের।'

'আমার মনে হয় কারিনাকে আগে খুঁজে বের করা দরকার,' হিপো বলল। 'কাজটা আমাকে দিতে পারিস। তোরা গিয়ে আবার হাঙরের পেটে যাওয়ার মত কোন কোন অঘটন ঘটাতে ব্যস্ত থাক, ওই সময়ে...'

কাঁচ ভাঙার শব্দে থেমে গেল হিপো। ঝনঝন শব্দটা চমকে দিল তিনজনকেই। জানালার কাঁচ ভেঙে ছুটে এসেছে একটা বাদামী রঙের বোতল। কোকোনাট সোডার।

কে ছুঁড়েছে ধরার জন্য দৌড়ে বেরিয়ে গেল হিপো আর আবীর। বোতলটা তুলে নিল অনিক। এবোতলটায় সোডা কিংবা বারুদের পরিবর্তে ভরা রয়েছে এক টুকরো কাগজ। পকেটনাইফের সাহায্যে কাগজটা বোতল থেকে বের করে আনল সে। ভাঁজ খুলল। কিছুই লেখা নেই কাগজে, শুধু গোল কালো কালিতে একটা বৃত্ত আঁকা। বৃত্তের ভিতরের সাদা অংশটাও কালি দিয়ে ভরাট করে দেয়া হয়েছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল আবীর আর হিপো। আবীর জানাল, 'কাউকে পেলাম না। হয় বোতলটা ছুঁড়েই কোথাও দৌড়ে পালিয়েছে যে ছুঁড়েছে, নয়তো লুকিয়ে পড়েছে।'

'বোতলের ভিতর এটা পেলাম,' কাগজটা দেখাল অনিক।

দেখতে দেখতে ভুরু কুঁচকে গেল আবীরের। 'মানে কী এর?'

'মানেটা আমি জানি,' হিপো বলল। 'ট্রেজার আইল্যান্ড বইতে পড়েছি, জলদস্যুরা কাউকে খুন করার আগে সাবধান করার জন্য কালো বিন্দু এঁকে পাঠায়। নিশ্চয় এই লোকটাও বইয়ের ওই চরিত্রগুলোকেই অনুসরণ করেছে।'

'কালো বিন্দু!...ব্ল্যাক স্পট!' আনমনে বিড়বিড় করছে আবীর। ট্রেজার আইল্যান্ড সে-ও পড়েছে। মনে করার চেষ্টা করছে, কোন জায়গাটায় লেখা আছে। মনে পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে

পড়েছে এখন।'

অনিক কিছু বলছে না। কালো গোল বৃত্তটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যেন বোঝার চেষ্টা করছে, এটা ওদের মৃত্যু পরোয়ানা কিনা।

মোঃ শাওন হোসেন রাজু স স্ক্যান

নয়

'আমাদেরকে কেউ খুন করতে চায়?' ধপ করে সোফায় বসে পড়ল আবীর। 'কে লোকটা?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল অনিক। 'তবে কেন হুমকি দিচ্ছে, সেটা অনুমান করতে পারছি। কেউ একজন জেনে গেছে, আমরা কারিনা অ্যান্ডারসনের কেসটার তদন্ত করছি।' কালো চুলে আঙুল চালাল সে। 'আর সেই লোকটাই আমাদেরকে কেস থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিচ্ছে।'

'তারমানে,' বাদামী বোতলটা তুলে নিতে নিতে হিপো বলল, 'কারিনাকে যে খুন করতে চায় সে-ই কালো বৃত্ত আঁকা এই কাগজটা পাঠিয়েছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল অনিক।

'হুঁ।' সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল হিপো। আবার বসে পড়ল। 'এখন খাওয়ার ব্যাপারে খানিকটা চিন্তা-ভাবনা করলে কেমন হয়? এধরনের হুমকি-ধামকি আর মেরে ফেলার ভয় আমার খিদে বাড়িয়ে দেয়।'

শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে গোসল করে এল তিনজনেই। ধোয়া

প্যান্ট-শার্ট পরল। তারপর বেরোল।

'সোর্ড ফিশ' নামে সোফ্রিয়ারের ছোট একটা রেস্টুরেন্ট আছে। তাতে অনিক-আবীরকে নিয়ে এল হিপো। ছবি আর মাছধরা জাল দিয়ে দেয়াল সাজানো। ঘরে প্রচুর ভিড়, চেঁচামেচি আর বাসন-পেয়ালার খটখটানি।

ওয়েইটার খাবার দিয়ে গেল। ছাগলের মাংসের ঝোল। বাটির দিকে তাকিয়ে খাবারটা কেমন হবে ভাবল অনিক। তারপর বলল, 'এখন পর্যন্ত যা যা সূত্র পাওয়া গেছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে দেখা যাক। এরপর আমাদের কী করা উচিত, ঠিক করতে হবে।'

আবীরও সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছাগলের মাংসের ঝোলের দিকে। মুখ তুলে বলল, 'বর্তমানে আমাদের প্রধান দুই সন্দেহভাজন, ম্যাসন মোঁপা আর মারজি পিটম্যান। ম্যাসনের কারিনাকে খুন করার কোনো মোটিভ নেই। কিন্তু কারিনা নিখোঁজ হওয়ার আগে তাকে শেষ দেখেছেন তিনি। আজকে আমাদের জাহাজে ওঠাটা ভাল চোখে দেখেননি তিনি। অনিকের পায়ে দড়ি পেঁচিয়ে আরেকটু হলেই ওকে খুনই করে ফেলছিলেন।'

'আরেকটা কথা ভুললে চলবে না,' চামচে করে খানিকটা ঝোল তুলে নিয়ে সাবধানে মুখে দিল অনিক। মাথা ঝাঁকাল। 'না, যা ভেবে খেতে দ্বিধা করছিলাম, তা না। শুয়োর না, ছাগলই। খেতে পারিস।...হ্যাঁ, যা বলছিলাম। দলে ম্যাসনই একমাত্র লোক, যিনি আজ সকালে কারিনাকে খুঁজতে যেতে বাধা দিয়েছেন। মূল্যবান সময় নষ্ট করতে তিনি রাজি নন। এটা একটা ছুতো হতে পারে।...যাই বলিস, রান্নাটা কিন্তু চমৎকার। অকারণে খাওয়ার আগে সন্দেহ করেছি।'

মাংস নিয়ে সন্দেহ করেছে অনিক আর আবীর, হিপো করেনি।

বাটির ঝোল শেষ করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। সামুদ্রিক মাছের কাবাবে নারকেলের সস ঢালল সে। চামচ দিয়ে মিশাতে মিশাতে বলল, 'কারিনা কাল রাতে ম্যাসনের হিসেবের খাতা ঠিক করেছে। এমন হতে পারে, খাতায় কোনো গণ্ডগোল দেখতে পেয়েছিল, হিসেবের গড়মিল, যেটা ম্যাসনকে বিপদে ফেলে দিতে পারত। আর সেকারণেই হয়তো কারিনার মুখ বন্ধ করে দিতে চেয়েছেন ম্যাসন।'

'অসম্ভব না,' আবীর বলল। ছাগলের মাংসের ঝোল শেষ করে, হিপোর মত মাছ না নিয়ে মুরগীর প্লেটটা টেনে নিল। ছোট ছোট টুকরো করে কাটা মাংস প্রচুর মরিচ আর মশলা দিয়ে ঝাল-রান্না। ক্যারিবিয়ানদের প্রিয় খাবার।

'মারজি পিটম্যান আমাদের দ্বিতীয় সন্দেহভাজন,' অনিক বলল। 'তার কী মোটিভ এখন আলোচনা করে দেখি। মহিলাকে আমার খারাপ মনে হয়নি, বরং ভালই লেগেছে, যদিও মারমেড প্রিন্সেসের জিনিসপত্র চুরি করছে সে। কারিনা ছিল তার রুমমেট। মারজির চুরি করার ব্যাপারটা নিশ্চয় জেনে ফেলেছে।...এই আবীর, মুরগিটা কেমন?'

'অতিরিক্ত ঝাল!' মুখ হাঁ করে বাতাস টেনে জিভ ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করছে আবীর। 'শুধু এই একটা কারণেই কারিনাকে খুন করতে চাইবে মারজি?'

'ঝালের জন্য?' হিপোর প্রশ্ন।

হেসে ফেলল অনিক। 'খাবার দেখলে মাথাটা গড়বড় হয়ে যায় তোর। আমি বলতে চাইছি মারজির কথা। কারিনাকে খুন করতে চাওয়ার মোটিভ আছে তার। মারমেড প্রিন্সেসের জিনিস চুরি করেছে—কথাটা জানাজানি হলে জেলে তো যাবেই, চুরি করা জিনিসগুলোও হাতছাড়া হবে। অনেক দামি রেলিক, কোনো সন্দেহ

নেই। হাজার হাজার ডলার দাম। এরচেয়ে অনেক কম টাকার জন্য মানুষে মানুষ খুন করে।'

'নীল আর কোয়ানকে সন্দেহ করছিস না কেন?' ভুরু নাচাল হিপো।

'করছি না কে বলল? জনসনের জাহাজে চুরি-ডাকাতির চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না, এটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে ওরা। তাই নিয়মিত কর্মী হিসেবে দলে যোগ দিতে চেয়েছে, যাতে জাহাজে উঠে কিংবা অন্য কোনোভাবে চুরি করার সুযোগ পায়। জনসন নিতে রাজি হননি। কর্মীদের কাউকে সরাতে না পারলে কর্মখালি হবে না, যোগ দেয়ার সুযোগও পাবে না, সেজন্য হয়তো কারিনাকে খুন করে একটা পদ খালি করতে চেয়েছে। এটা একটা মোটিভ হতে পারে। তবে ওদেরকে আমি অতটা সন্দেহ করছি না।'

'কেন, করছিস না কেন?' ভাজা কাঁচকলার প্লেটের দিকে হাত বাড়াল আবীর। 'ওদেরকেই তো বেশি সন্দেহ করা উচিত। কারিনাকে খুন করতে না পেরে আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল। ভেবেছিল আমরা দুজন না থাকলে ওরা দুজন আমাদের জায়গায় ঢুকতে পারবে। আমাদেরকে জনসনের লোক মনে করেছিল ওরা।'

'শুধু দলে ঢোকার জন্য কাউকে খুন করতে চাইবে?' খাবার চিবাতে চিবাতে হিপো বলল। 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। এতটা বাড়াবাড়ি করবে?'

'ওদের তুই দেখিসনি, হিপো,' এক চামচ কলাভাজা মুখে পুরে দিল আবীর। 'তাই তোর বিশ্বাস হচ্ছে না। বদ্ধ উন্মাদ ওই দুটো। ওদের দিয়ে সব সম্ভব।'

'যাই হোক, সন্দেহ করার মত চারজনকে পেলাম, কারিনাকে খুন করার মোটিভ আছে যাদের,' অনিক বলল। 'আর কাকে সন্দেহ

করা যায়?'

'আমার অক্সিজেন ট্যাংকে অক্সিজেন ভরার সময় ডিক বলেছে রিফিল ট্যাংকে অক্সিজেন কম,' আবীর বলল। 'তার ধারণা, রাতে চুরি করে পানিতে ডুব দিয়েছিল অ্যান্থনি আর নুশান। কেন দেবে? তারমানে ওই দুই ভাইও মারমেড প্রিন্সেসের জিনিস চুরি করছে। আর সেটা হয়তো দেখে ফেলেছে কারিনা। তাই তাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে দুই ভাই।'

'এটাও একটা সম্ভাবনা,' অনিক বলল। 'তারমানে সন্দেহভাজন এখন দাঁড়াল গিয়ে ছয়জন। তবে শুধু চুরি করতে দেখে বলেছে বলে কেউ কাউকে খুন করতে চায়, এটা বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। আর কিছু ঘটছে না তো স্কেলিটন রীফে, মারমেড প্রিন্সেস যেখানে ডুবেছে সেই জায়গাটায়?'

*

খাওয়া সেরে যখন রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোল ওরা, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রাতের আঁধার নামবে। দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে পাহাড়ের একটা খাড়াই বেয়ে জীপ চালিয়ে উঠছে অনিক। একা। মাথার ওপর বজ্রের গুড়ুগুড়ু। খাবার টেবিলে বসে আলোচনার পর ঠিক করেছে তিনজনে, রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আলাদা হয়ে যাবে। অনিক যাবে ম্যাসন মোঁপার বাড়িতে। হিপো আর আবীর যাবে মারজি পিটম্যানের বাসায়। কেউ বাড়িতে না থাকলেও ঢুকবে। সূত্র খুঁজবে। ওদের ঠিকানা পেয়েছে হোয়াইট সোয়ান থেকে অনিকের চুরি করে আনা নামের তালিকাটায়।

বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। পিটির পিটির আওয়াজ করছে জীপের ক্যানভাসের ছাতে। উইন্ডশীল্ড ওয়াইপার চালু করে দিল অনিক। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, আজকের দুর্যোগময় রাতটাও কি

সেরাতের মতই, বহুকাল আগে যেদিন ডুবে গিয়েছিল মারমেড প্রিন্সেস? ভাবতে কেমন লাগে!

পাহাড়ের ওপরের নিঃসঙ্গ বাড়িটা যখন চোখে পড়ল তার, রাতের গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে তখন।

বাড়ির সামনে এনে গাড়ি থামাল অনিক। ম্যাসনের বাড়ি। বিশাল। এদ্বীপের অভিজাত ধনীদের বাড়ি যেমন হয়। গাড়ি থেকে নেমে মাথা নিচু করে দৌড় দিল সদর দরজার দিকে। দরজার পাল্লায় জোরে জোরে থাবা মেরে অপেক্ষা করতে লাগল। জবাব এল না। তার মনে পড়ল, ক্যারিবিয়ানের মানুষ সাধারণত দরজায় তালা লাগায় না। নব ধরে মোচড় দিতেই দেখল, খোলা। ঢুকে পড়ল ভিতরে।

বিশাল লিভিং রুমের মেঝেটা কাঠের তৈরি। চমৎকার পালিশ করা। বেশির ভাগ আসবাব বেতের তৈরি। সুন্দর দুটো ফ্লোর ল্যাম্প হলদেটে আলো ছড়াচ্ছে। তারমানে লোক আছে বাড়িতে।

'কেউ আছেন?' ডাকল অনিক। জবাব এল না।

ঘরের অন্যপ্রান্তে একটা দরজা। বারান্দায় বেরিয়েছে। সেখানে এসে ম্যাসনকে দেখতে পেল সে। মুষলধারা বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আছেন। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। অনিক যে বাড়িতে ঢুকেছে শুনতে পাননি।

অনিক ডাকল, 'মিস্টার ম্যাসন?'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন ম্যাসন। 'তুমি? এখানে কী?' তাঁর ভাবভঙ্গিই বলে দিচ্ছে কোনো ব্যাপারে খুব অশান্তিতে আছেন তিনি। দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত মন।

'অনুমতি না নিয়ে এভাবে ঢুকে পড়ার জন্য দুঃখিত,' অনিক বলল। 'সার, আমি জার্নালিজমে আগ্রহী। আমার মনে হয়েছে,

স্কেলিটন রীফের এই গুপ্তধন উদ্ধারের ঘটনাটা নিয়ে দারুণ একটা গল্প হবে, আমাদের স্কুল ম্যাগাজিনে ছাপতে পারব। সেজন্য...ভাবলাম...আপনার কাছে আসি, এব্যাপারে তথ্য নেয়ার জন্য।'

'প্রশ্নের জবাব দিতে আমার ভাল লাগে না,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ম্যাসন। 'তবে আজ দেব। কারণ, দুপুরে জাহাজে আজ আরেকটু হলেই তোমাকে মেরে ফেলেছিলাম। খুব খারাপ লেগেছে আমার। আর সেই খারাপ লাগাটা পোষানোর জন্যই কয়েক মিনিট সময় দিচ্ছি তোমাকে। বলো, কী জানতে চাও?'

বারান্দার টিনের চালায় এত জোরে আঘাত হানছে বৃষ্টির ফোঁটা, কথা শোনা যায় না। অনিক দেখল, বারান্দাটা মুখ করে আছে বিশাল এক কলাক্ষেতের দিকে। বড় বড় পাতাওয়ালা ফলভর্তি গাছগুলোকে অন্ধকারে ঘন জঙ্গলের মত লাগছে।

পকেট থেকে নোটবুক আর কলম বের করল অনিক। 'আমার প্রথম প্রশ্ন, এই গুপ্তধন শিকারে আপনি আগ্রহী হলেন কেন?'

কলাক্ষেতের দিকে হাত তুললেন ম্যাসন। 'দেখো, একরের পর একর কলাগাছ। প্রায় প্রতিটি গাছেই কলা ধরেছে। একটা সময় এই কলা বেচে প্রচুর টাকা আয় করেছি আমি। ক্যারিবিয়ানে তখন কলার ব্যবসায় এত লাভ ছিল, লোকে কলার নামই দিয়ে ফেলেছিল—সবুজ সোনা।'

'তাই? একটা নতুন তথ্য জানলাম। আমাদের দেশে পাটকে সোনালি আঁশ বলা হতো একসময়। এখন আর পাটের সেই কদর নেই।'

'এখানে কলারও সেই অবস্থাই হয়েছে,' ম্যাসন বললেন। 'আসছি সেকথায়। তবে তার আগে আরেকটা কথা বলে নিই। বছর

দুই আগে সেইন্ট লুসিয়ায় এসেছিল ইমবেলিক জনসন। সমস্ত ব্যবসায়ীদের দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিতে লাগল তার অভিযানের জন্য টাকা জোগাড়ের জন্য। সবাই মানা করে দিল, একমাত্র আমি বাদে। বাড়তি কিছু টাকা তখন জমে গিয়েছিল আমার হাতে। এককথায় বোকার মত সেই গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য টাকাটা আমি খরচ করে ফেললাম। জনসন আমাকে অবশ্য বলেছিল—এতে ঝুঁকি আছে, গুপ্তধন পাওয়া যাবে কিনা অনিশ্চিত, তবে যদি পাওয়া যায়, লাভের অর্ধেক টাকা আমাকে দিয়ে দেবে।'

'সোজা কথায় মস্ত একটা জুয়া খেলেছেন,' অনিক বলল। 'বেশি লাভের আশায়।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন ম্যাসন, 'জুয়া ছাড়া আর কী বলব! আরও একটা কথা ভাবিনি, গুপ্তধন যদি পাওয়া যায়, লাভও হয়, তাহলেও সেই লাভের টাকা আমার হাতে আসতে কয়েক বছর লেগে যাবে। মস্ত এক সমস্যায় পড়ে গেছি।'

বিকট শব্দে বাজ পড়ল। শব্দটা দূরে সরে গেলে অনিক জিজ্ঞেস করল, 'কী সমস্যা?'

'বর্তমানে ইয়োরোপ-আমেরিকার মত ধনী দেশগুলো কলা কিনছে মধ্য আমেরিকা থেকে। তাতে আমাদের ব্যবসা হয়ে যাচ্ছে খারাপ, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি আমরা। একদিকে ব্যবসা খারাপ, অন্য দিকে গুপ্তধন উদ্ধারের পিছনে পানির মত টাকা খরচ করে করে ফতুর হয়ে গেছি আমি। কোন্ বুদ্ধিতে একাজ করতে গিয়েছিলাম সেটা ভেবে ভেবে এখন মাথা গরম করা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমার। এত টাকা খরচ হবে কল্পনাই করতে পারিনি। সাংঘাতিক টাকার টানাটানিতে পড়ে গেছি এখন।'

'শুনে খারাপই লাগছে আমার,' সহানুভূতি জানাল অনিক।

'এত খারাপ যে কল্পনা করতে পারবে না। বেতন দিতে না পারায় কর্মচারী ছাঁটাই করতে হয়েছে, যে কাজ আমার কোনকালে করতে হয়নি। ফুল-টাইম অ্যাকাউন্ট্যান্ট রাখতে না পেরে কারিনাকে পার্ট-টাইম চাকরি দিয়েছি, আমার হিসেবপত্রগুলো দেখে দেয়ার জন্য।'

'এতটাই খারাপ?'

'এতটাই খারাপ। পকেটে টাকা না থাকলে মেজাজও খারাপ থাকে। আর যাদের একসময় ছিল, এখন নেই তাদের তো আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। বুঝতে পারছ আমার অবস্থাটা? সেকারণেই আজ দুপুরবেলা তোমাদের সঙ্গে এমন আচরণ করেছি। চলো, ভিতরে চলো। ভিজে যাচ্ছি।'

ম্যাসনকে অনুসরণ করে লিভিং রুমে ফিরে এল অনিক। বড় বড় বেতের চেয়ারে বসল দুজনে। একটা কথাও না বলে হাতের তালুতে মাথা রাখলেন ম্যাসন। কপাল ডলতে লাগলেন। নীরবে তাকিয়ে আছে অনিক। ম্যাসনের মেজাজের পরিবর্তন হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। সেটা কি টাকার অভাব, না সাংঘাতিক কোনো অপরাধ ঘটানোর কারণে? যেমন, খুন! গতরাতে কাউকে খুনের চেষ্টা করেননি তো? নাকি করেই বসে আছেন?

'আপনি ঠিক আছেন তো, সার?' জিজ্ঞেস করল অনিক।

'না,' বিড়বিড় করে কথাগুলো যেন নিজেকেই শোনালেন ম্যাসন, 'ঠিক নেই! একটা জিনিস অনবরত খুঁচিয়ে চলেছে আমাকে। অপরাধবোধ।'

'তারমানে টাকার সমস্যা ছাড়াও আরও সমস্যা আছে আপনার?' ভদ্রলোক মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে গেছেন বলে মনে হলো অনিকের। এসব পরিস্থিতিতে মানুষ অনেক সময় অন্য কাউকে মনের

কথা খুলে বলে ভারমুক্ত হতে চায়। ম্যাসনও কি তাই চান? সব কথা বলতে চাইছেন ওকে?

'কীসের অপরাধ?' সহানুভূতির সঙ্গে জানতে চাইল অনিক।

'কাল রাতে আমি খুব খারাপ একটা কাজ করেছি,' প্রায় ফিসফিস করে বললেন ম্যাসন।

'কী?' কোমল স্বরে প্রশ্ন করল অনিক।

মাথা তুলে বারান্দার বাইরে তাকিয়ে রইলেন ম্যাসন। কলার পাতায় আছড়ে পড়া তুমুল বর্ষণের দিকে। তারপর ফিরে তাকালেন অনিকের দিকে। ধীরে ধীরে বললেন, 'গতরাতে আমার হিসেবের খাতায় কতগুলো ভুল খুঁজে পেয়েছে কারিনা। ভুলগুলো আমিই করেছি, ইচ্ছে করে, ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার জন্য। পুরোটা নয়, কিছুটা কম করতে চেয়েছি। বুঝতেই পারছ...টাকার জন্য কতটা মরিয়া এখন আমি।...আমাকে টিটকারি মারতে শুরু করল কারিনা।'

কান খাড়া হয়ে গেল অনিকের। শুধু ট্যাক্স ফাঁকি দিতে চেয়েছিলেন বলে এতটা বিমর্ষ হয়ে যাওয়ার কথা নয় ম্যাসনের। জিজ্ঞেস করল, 'তারপর?'

'কারিনার টিটকারি সইতে পারলাম না। ভীষণ রাগ হলো। ওকে ধমকানো শুরু করলাম। আমার আচরণে প্রথমে হতচকিত হয়ে গেল কারিনা। কাঁদতে শুরু করল। শেষে দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।'

'শুধু ধমকেছেন বলেই এই কাণ্ড করল? আপনি তার বস। তার কোন আচরণ আপনার কাছে বেয়াদবি মনে হলে আপনি তাকে ধমকাতেই পারেন।'

'তা পারি। তবে সবকিছুরই একটা সীমা থাকে। আমি বোধহয় একটু বেশি বাড়াবাড়িই করে ফেলেছিলাম। আমার বিশ্বাস, সেকারণেই আজ জাহাজে কাজ করতে আসেনি ও। উদ্ধার কাজে

সমস্যা সৃষ্টি করে আমাকে শাস্তি দিতে চায়। তা যদি করে থাকে তাহলে সে-ও ভাল করছে না। এসব করে শাস্তি দিতে পারবে না আমাকে। উদ্ধার কাজেও তেমন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। তবে, আমার তীব্র অনুশোচনা হচ্ছে। অপরাধবোধটা যাচ্ছে না কোনোমতেই। কারিনার মত একটা সুন্দরী মেয়েকে, জাহাজের সবচেয়ে ভাল মেয়েটাকে আমি এভাবে ধমকাতে পারলাম!'

সব কথাই মন দিয়ে শুনল অনিক। ধমকানো নিয়ে ম্যাসনের এই অপরাধবোধটাও বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে তার কাছে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইছেন না তো? টাকার ওপর দোষ চাপিয়ে কারিনার রহস্যজনক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাটাকে চাপা দিতে চাইছেন হয়তো।

'শুধু একারণেই যদি কারিনার মন খারাপ হয়ে থাকে,' অনিক বলল, 'তাহলে চিন্তা নেই। কারিনা ফিরে আসবে। তখন আর আপনার ওপর মন খারাপ থাকবে না ওর।'

'আমিও জানি, তারপরেও মনকে বোঝাতে পারছি না। যদি ফিরে না আসে?' অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছেন ম্যাসন।

অনিকের মনে হলো, তার বোঝানোতে বোধহয় কাজ হয়েছে।

মাথাঝাড়া দিয়ে যেন সমস্ত উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন ম্যাসন। 'এখন...তোমার যদি শেষ হয়ে থাকে...আমি একটু একা থাকতে চাই। জরুরী কিছু কাজও আছে, সেরে ফেলতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। আমাকে সময় দেয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' উঠে দাঁড়াল অনিক। বৃষ্টি থেমে গেছে, খেয়াল করল এতক্ষণে।

*

বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য গ্রামের একটা পাবলিক হলে ঢুকেছিল আবীর ও হিপো। বৃষ্টি থামলে বেরিয়ে এসেছে। গ্রামের একটা কাঁচা রাস্তা

ধরে হেঁটে চলেছে মারজি পিটম্যানের বাড়ির দিকে।

ছোট একটা বাংলো-বাড়ির সামনে এসে হিপো বলল, 'আমার মনে হয় ওই বাড়িটাই।'

পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাড়িটা। বৃষ্টিতে ভিজে আছে উঠানের মাটি। পিচ্ছিল কাদা। সাবধানে পা ফেলে এগিয়ে চলল দুজনে, যাতে আছাড় খেতে না নয়। প্রচুর গাছপালা আর ঝোপঝাড় ঘিরে রেখেছে বাড়িটাকে। বিশ্রীভাবে রঙ চটে গেছে দেয়ালের। টিনের চালার রঙ আর নেই বললেই চলে। তবে টর্চের আলোয় দরজায় লেখা ঠিকানাটা পড়া গেল।

ঘরে আলো নেই। দরজায় থাবা দিল আবীর। জবাব এল না। দরজা খোলার চেষ্টা করল সে। তালা লাগানো। খাকি প্যান্টের পকেট থেকে পাতলা ছোট একটুকরো ধাতব পাত বের করল। এরকম পরিস্থিতিতে পড়তে হতে পারে ভেবে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে পাতটা। নবের তালার ফোকরে ঢুকিয়ে বিশেষ কায়দায় কয়েকটা আলতো মোচড় দিতেই খুলে গেল তালা।

অন্ধকার বাংলোয় ঢুকল দুজনে। দরজায় পাতা ডোরম্যাটে ভালমত জুতোর কাদা মুছে নিয়েছে যাতে ঘরের ভিতর ছাপ না পড়ে। পাল্লাটা লাগিয়ে দিল আবার আবীর। বাটন টিপে নবের লক লাগিয়ে দিল যাতে বাইরে থেকে চাবি ছাড়া কেউ খুলতে না পারে। তারপর টর্চের আলোয় ঘরের ভিতর খুঁজতে শুরু করল। লিভিং রুমে রইল আবীর। হিপো খুঁজতে গেল বেডরুম আর বাথরুমে।

বসার জন্য কয়েকটা সাধারণ চেয়ার আর দুধের টিনের প্যাকিং বাক্স রেখে দেয়া হয়েছে লিভিং রুমে। কোথাও কোনো গুপ্তধন পড়ে থাকতে দেখল না আবীর। থাকার কথাও নয়। গুপ্তধন কেউ খোলা জায়গায় ফেলে রাখে না।

ঢুকছে। ঘরের লাগোয়া রান্নাঘর। খোলা দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখা যাচ্ছে ওকে। মারজি কী করে দেখতে লাগল আবীর। পাতলা রবারের দুটো দস্তানা নিয়ে হাতে পরল মারজি। রান্নাঘরের টেবিলে একটা বোতল বের করে রাখল। ভুরু কুঁচকে, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে বোতলের গায়ের লেখা পড়ার চেষ্টা করল আবীর। মুরিয়াটিক অ্যাসিড।

সিংকের নিচের একটা ধাতব কেবিনেট খুলল মারজি। দুটো প্লাস্টিকের গামলা বের করে টেবিলে রাখল। সেগুলো থেকে কয়েকটা জিনিস তুলে নিয়ে কাউন্টারে রাখল। চকচকে রূপার মুদ্রা, আধখানা টিনের বাসন, টিনের চামচ ও কাঁটা চামচ, চিনামাটির চায়ের কাপের ভাঙা টুকরো, একটা অ্যানটিক পিস্তল আর কয়েকটা ধাতুর ছোট বল-পিস্তলের গুলি হিসেবে ব্যবহার হতো সেগুলো। তারপর সোনার একটা চেন বের করে আনল মারজি। তাতে একটা ড্রাগনের মূর্তি লকেট হিসেবে লাগানো। চকচকে দুটো পান্না পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ড্রাগনের চোখ। মুখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে ড্রাগনের। আগুন বানানো হয়েছে তিনটে লাল চুনি পাথর দিয়ে।

মারমেড প্রিন্সেস থেকে আনা রেলিক এগুলো, কোনো সন্দেহ নেই আবীরের। অ্যাসিডে ভিজিয়ে রেখে ওগুলোতে লেগে থাকা কঠিন আবরণও খসিয়ে ফেলা হয়েছে। কয়েকটা পরিষ্কার প্লাস্টিকের ব্যাগ বের করে ট্যাপের পানি ভরল মারজি। তাতে খানিকটা করে লবণ ফেলে দিল। আলাদা আলাদাভাবে জিনিসগুলো ওসব ব্যাগে ভরে ব্যাগের মুখ ভালমত বন্ধ করল।

প্লাস্টিকের ব্যাগগুলো হাতে নিয়ে সুইচ টিপে রান্নাঘরের আলো নিভাল সে। ব্যাগ হাতে বেরিয়ে গেল সামনের দরজা দিয়ে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে নিঃশব্দে আলমারি থেকে অন্ধকার ঘরে বেরিয়ে

এল আবীর ও হিপো।

'বাথরুমের জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করব নাকি?' হিপোর প্রশ্ন।

'এক সেকেন্ড। মারজি কী করে দেখে আসি।' ফিসফিস করে বলে লিভিং রুমের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল আবীর। চোরাই জিনিসগুলো নিয়ে মারজি কোথায় যায়, দেখার ইচ্ছে তার। জানালার পুরানো একটা পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিল সে।

বাংলোর একপাশে দাঁড়িয়ে আছে মারজি। আবীরের একেবারে চোখের সামনে। লিভিং রুমটা অন্ধকার। সুতরাং সহজে তাকে দেখার কোনো সুযোগ নেই মারজির। একটা বেলচা দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল মারজি।

'কী করছে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল হিপো।

'বিশ্বাস করতে পারছি না,' ফিসফিস করেই জবাব দিল আবীর। 'মনে হয় রেলিকগুলো মাটির নিচে পুঁতে রাখছে সে।'

মাটিতে ছোট একটা গর্ত করল মারজি। টর্চ জ্বেলে দেখল। অবাক হয়ে আবীর দেখল, ওই গর্তটাতে আরও কতগুলো পানি ভর্তি ব্যাগ রয়েছে। সেগুলোর ওপর নতুন নিয়ে যাওয়া ব্যাগগুলো রেখে বেলচা দিয়ে আবার মাটি চাপা দিয়ে দিল মারজি।

'জায়গাটায় চিহ্ন দিয়ে রাখে,' আবীর বলল। 'যাতে পরের বার খুঁড়তে গিয়ে ভুল না হয়।'

'ও বোধহয় ফিরে আসছে,' ফিসফিস করে হিপো বলল। 'জলদি চল। বাথরুমের জানালা দিয়ে বেরোনো যায় কিনা চেষ্টা করে দেখি।'

সাবধানে পা টিপে টিপে আন্দাজে অন্ধকার ঘরের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল দুজনে। বাথরুমে ঢুকল। জানালাটা বেশ বড়। বেরোতে পারবে বলে মনে হলো। খুলতে গিয়ে পারল না হিপো।

বহুকাল বোধহয় খোলা হয় না, আটকে গেছে পাল্লাগুলো। আবীরও হাত লাগাল। কিন্তু তারপরেও নড়ানো গেল না।

'তালা তো নেই,' আবীর বলল। 'জ্যাম হয়ে গেছে।'

মারজিকে বাংলোয় ঢুকতে শুনল ওরা।

জানালার পাল্লায় জোরে আবার ঠেলা মারল দুজনে। সামান্য একটু নড়ল বলে মনে হলো। কিন্তু এখনও খোলেনি। ঠেলা দিতে গিয়ে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল হিপোর মুখ থেকে। চোখ বুজে ফেলল সে। নিজের ওপরই রেগে গেছে।

বরফের মত জমে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল দুজনে। কান পেতে থেকে বোঝার চেষ্টা করল ওরা, মারজি শব্দটা শুনে ফেলেছে কিনা।

'কে?' লিভিং রুম থেকে চিৎকার করে উঠল মারজি। 'কে ওখানে?'

নীরব উত্তেজনায় পরস্পরের দিকে তাকাল হিপো ও আবীর।

'ওখানে কেউ থেকে থাকলে বেরিয়ে এসো,' চেঁচিয়ে বলল আবার মারজি। 'আমার হাতে অ্যাসিডের বোতল আছে।'

হাত তুলল হিপো। ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইল, জানান দেবে কিনা? মাথা নেড়ে মানা করল আবীর। ভাবছে। ভাল বেকায়দায় পড়েছে। তবে গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে এরচেয়ে কঠিন পরিস্থিতি থেকেও নিরাপদে বেরিয়ে এসেছে। অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল সে।

'এখনও বলছি বেরিয়ে এসো,' বাথরুমের দিকে এগিয়ে আসছে মারজি। 'আমার হাতে ভয়ঙ্কর অ্যাসিড। মুখ পুড়ে ঝলসে যাবে। মাংস খসে যাবে।'

মরিয়া ভঙ্গিতে আবীরের দিকে তাকাল হিপো।

'শুনছ!' আরও কাছে চলে এসেছে মারজি। 'ওখানে কেউ

থাকলে এখনও সময় আছে, ভাল চাও তো বেরিয়ে এসো। চোর আমি দুচোখে দেখতে পারি না। আমাকে না জানিয়ে কেউ আমার ঘরে ঢুকলে ভীষণ রাগ লাগে আমার। অ্যাসিড ছুঁড়তে এক বিন্দুও হাত কাঁপবে না আমার বলে দিলাম।'

মারজির শেষের কথাগুলো বলার সময় আচমকা জানালার পাল্লায় প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরেছে আবীর। এবার আর আটকে থাকতে পারেনি পাল্লা, খুলে গেছে। শব্দ হয়েছে, তবে সেটা ঢাকা পড়ে গেছে মারজির চিৎকারের আড়ালে।

'এই,' চেঁচিয়ে বলল মারজি, 'তুমি কি বাথরুমে?'

জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল আবীর। বিশাল শরীর নিয়ে জানালা দিয়ে বেরোতে গিয়ে ভুঁড়ি আটকে গেল হিপোর। হাঁসফাঁস করতে লাগল সে। টেনেহিঁচড়ে তাকে বের করে নিয়ে গেল আবীর। ভিজা, পিচ্ছিল কাদার মধ্যে দিয়ে যতটা দ্রুত সম্ভব দৌড়ে সরে যেতে লাগল ওরা বাংলোর কাছ থেকে। উঠানের পর বন। বনের ভিতর দিয়ে ছুটতে লাগল। অন্য পাশের সাদা বালির সৈকতে বেরিয়ে আসার আগে আর থামল না। ধপ করে বসে পড়ল হিপো। ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'উহ্, বড় বাঁচা বেঁচেছি। আরেকটু হলেই মুখটা গেছিল আজ!'

আবীরও বসে পড়ল হিপোর পাশে। 'আসলে হুমকি দিচ্ছিল। অ্যাসিড ছুঁড়ত না মারজি।'

'তাহলে বেরিয়ে এলি কেন?'

'দেখলে তো চিনে ফেলত।'

*

সোর্ড ফিশ রেস্টুরেন্টের সামনে রাত সাড়ে দশটায় অনিকের সঙ্গে দেখা করল আবীর ও হিপো। রাস্তা এখনও ভিজা। তবে আকাশের

অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে রাতের মত বিদেয় হয়েছে বৃষ্টি। রাস্তায় লোক নেই, মাত্র দু'চারজন। গাঁয়ের পথে চলতে চলতে যা যা জেনে এসেছে পরস্পরকে জানাতে লাগল অনিক, আবীর ও হিপো।

'হুঁ, তারমানে বোঝা যাচ্ছে কোনো একটা ব্যাপারে অপরাধবোধে ভুগছেন ম্যাসন মোঁপা,' অনিকের কথা শুনে বলল আবীর। 'কারিনাকে কটু কথা বলেছেন বলে, নাকি অন্য কিছু?'

'আসলে কারিনাকে খুন করার চেষ্টা করেছেন,' হিপো বলল।

'আর, আমরা এখন শিওর হয়ে গেলাম, জলদস্যুদের গুপ্তধন চুরি করছে মারজি পিটম্যান। আরও জানি, সে সেগুলো নিয়ে বাংলোর কাছে মাটিতে পুঁতে লুকিয়ে রাখছে, যে বাংলোয় কারিনাও তার সঙ্গে থাকত।'

'সোজা কথা,' আবীর বলল, 'একটু আগে আমরা যা জেনে এলাম তাতে পরিষ্কার হয়ে গেছে, ম্যাসন আর মারজি, দুজনেই অপরাধের সঙ্গে জড়িত।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল অনিক। 'মারজি গুপ্তধন চুরি করছে। ম্যাসন কিসের সঙ্গে জড়িত, তা এখনও স্পষ্ট নয় আমাদের কাছে। আন্দাজে বুঝে নিতে হচ্ছে। তবে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়া তো দূরের কথা, দুজনের ওপর সন্দেহ আরও গভীর হলো আমাদের।'

সামনে কিছুদূরে রাস্তার ওপর জটলা করছে কয়েকজন টুরিস্ট। স্থানীয় এক দ্বীপবাসী ঝাঁকড়াচুলো যুবক ঢোল নিয়ে তাদের মাঝখানে গিয়ে ঢুকল। ঢোলের খোলটা বানানো হয়েছে তেলের পিপা দিয়ে। টুরিস্টদের মাঝে গিয়ে সেই ঢোল বাজিয়ে গান গাওয়া শুরু করল যুবক। মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠ।

কয়েকটা সেকেন্ড স্থির দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল অনিক। মনে হলো গান শুনছে। আসলে গভীর ভাবনা চলেছে তার মগজে।

বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে আচমকা বলে উঠল অনিক, 'পুরো ব্যাপারটাকে অন্য আরেক দিক থেকে খতিয়ে দেখা যেতে পারে। কারিনাকে খুনের চেষ্টা করা হয়েছে যে রাতে, সেরাতের কথা ধরা যাক। পানির কিনারে সৈকতে পড়ে থাকতে দেখেছি ওকে। পরে আমাদের জানিয়েছে সে, দীর্ঘ পথ সাগরে সাঁতার কেটে পাড়ি দিয়েছে। তারমানে কোনো নৌকা বা জাহাজ থেকে ফেলে দেয়া হয়েছিল ওকে। ঠিক?'

'ঠিক,' অজান্তেই ঢোলের তালে তালে রাস্তায় পা ঠুকতে আরম্ভ করেছে হিপো। 'যে কেউ বোট জোগাড় করতে পারে এখানে–ম্যাসন, মারজি কিংবা যে কেউ।'

'তা পারে। আরও একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না আমাদের,' আবীর বলল, 'রাতের বেলা গুপ্তধন চুরি করতে সাগরে ডুব দেয় অ্যান্থনি আর নুশান–ওদের সহকর্মী ডিকের সন্দেহ। কোনো কারণে হয়তো রাতের বেলা হোয়াইট সোয়ানে গিয়েছিল কারিনা। দুই চাচাতো ভাইকে চুরি করে গুপ্তধন তুলে আনতে দেখে ফেলেছে। মুখ বন্ধ করার জন্য তখন জাহাজ থেকে কারিনাকে পানিতে ফেলে দিয়েছে ওরা।'

একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে কথাটা ভাবল তিনজনেই। আবীরের চোখ সেই গায়ক যুবকের দিকে। ঢোল বাজিয়ে গান গাইছে যুবক। গানের কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করল আবীর। কয়েকটা লাইন বুঝল। মানে করলে দাঁড়ায়:

ওই মেয়েটির সাথে মোর দেখা হলো
ক্ষণিকের তরে,
তারপর চলে গেল সে,
পুবে না পশ্চিমে, জানিনাকো আমি,
অথচ, কতই না ভালবেসেছিলাম তাকে!

কল্পনায় কারিনার চেহারাটা ফুটিয়ে তুলল আবীর। হাসপাতালের বিছানায় শোওয়া। বালিশে ছড়ানো লম্বা চুলের রাশি। এখন আর ওই বিছানায় নেই সে। কোথায় গেল? এই দ্বীপেই কি কোথাও আছে? কাছে, নাকি দূরে? বেঁচে আছে তো?

অবশেষে কথা বলল আবার অনিক, 'আমার মনে হয় না কারিনাকে হোয়াইট সোয়ান থেকে ফেলা হয়েছে। ওকে যেখানে পেয়েছি আমরা, জাহাজটা রয়েছে তার দক্ষিণে। সমুদ্রস্রোতও বইছে দক্ষিণে। তারমানে ওকে যেখানে পেয়েছি আমরা, হোয়াটই সোয়ান থেকে ফেললে স্রোতে ভেসে ওখানে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। বোট থেকেই যদি ফেলা হয়ে থাকে, তাহলে অন্য কোনো বোট, হোয়াইট সোয়ান না।'

'ঠিক বলেছিস তো,' একমত হলো আবীর। 'এই স্রোতের কথাটা তো ভেবে দেখিনি। যাকগে, কারিনার কথা আপাতত থাক। এখন নুশান আর অ্যান্থনি সত্যি সত্যি গুপ্তধন চুরি করছে কিনা জানা দরকার। বলা যায় না তদন্তে কী বেরিয়ে আসবে। দেখা যাবে, মারজি একা চুরি করছে না, কোনো একটা দলের সঙ্গে কাজ করছে সে।'

'ঠিক,' তুড়ি বাজাল হিপো। 'এক কাজ করি না কেন? আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে আসছে। চাচার প্লেনটা নিয়ে উড়ে যেতে পারি এখন। দেখে আসতে পারি হোয়াইট সোয়ানে এখন কী চলছে। রাতের বেলা পানিতে ডুব দিতে হলে আলো দরকার হবে ওদের। আকাশ থেকেও সেই আলো চোখে পড়বে। কি বলিস তোরা?'

লাফিয়ে উঠল অনিক। 'দারুণ কথা বলেছিস, হিপো! তোকে ছাড়া যে আমরা কী করতাম! চল চল!'

গাড়ি নিয়ে দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে চলে এল ওরা। ওদিকেই রয়েছে দ্বীপের এয়ারপোর্ট। অফিসে একটা ফ্লাইট প্ল্যান জমা দিয়ে এল হিপো। তারপর ভালমত পরীক্ষা করল তার চাচার সেসনা-১৭২ বিমানটা। একটু পরেই দক্ষ হাতে হুইল ধরল সে। বিমান নিয়ে আকাশে উড়ল। মাইক্রোফোন লাগানো হেডসেট পরে নিয়েছে তিনজনেই, যাতে ইঞ্জিনের গর্জনের মধ্য দিয়েও কথা চালাচালি করতে পারে। দ্বীপের এখানে ওখানে আলো মিটমিট করতে দেখল ওরা আকাশ থেকে। বেশির ভাগ হোটেল আর লোকালয়গুলো রয়েছে সমুদ্রতীরের কাছাকাছি।

শান্ত, অন্ধকার ক্যারিবিয়ান সাগরের ওপর দিয়ে উড়ে চলল প্লেন। হিপোর পাশে বসেছে অনিক। প্লেনের কম্পাস দেখে দেখে ক্রমাগত দাগ দিয়ে চলেছে কোলের ওপর বিছানো ম্যাপটাতে, যাত্রাপথের একটা রেখা এঁকে নিচ্ছে। মুখ তুলে একটুকরো মেঘের ফাঁকে চাঁদটাকে লুকোচুরি খেলতে দেখল সে। বাঁকা চাঁদকে যেন ঘিরে রেখেছে পানির দাগ, ভূতুড়ে লাগছে এই পরিবেশে।

'জাহাজটা আর কতদূর?' পিছনের সিট থেকে জানতে চাইল আবীর।

'মিনিটখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যাব,' জবাব দিল অনিক।

কিন্তু এক মিনিট পর জাহাজের ওপরে পৌঁছানো তো দূরের কথা, ডাইভিং সাইটে ওটার চিহ্নও দেখল না ওরা। প্লেনের ডানার নিচে সেই আগের মতই সাগরের পানি, শুধুই সাগর, আর কিছু নেই। অনিকের হিসেবে ভুল হয়েছে ভেবে সামনে-পিছনে আর দুই পাশে বেশ কিছুটা জায়গা ঘুরে এল হিপো।

'নিচে তো পানি ছাড়া আর কিছু দেখছি না,' কয়েক মিনিট ঘোরাঘুরির পর অবশেষে কথা বলল হিপো। 'অনিক, আমার মনে

হয়, ম্যাপে নেভিগ্যাশন লাইন আঁকতে ভুল করিসনি তুই। আর যদি করেও থাকিস, অনেকখানি তো ঘুরে এলাম। রীফের দক্ষিণের অঞ্চলটা পুরো ঘুরে ফেলেছি। জাহাজ কই?'

'অবাক লাগছে আমার,' কপাল ডলতে লাগল অনিক। 'প্রথম যে জায়গাটায় গিয়েছিলাম আমরা, সেখানে ফিরে যা তো আবার।'

প্লেন ঘুরিয়ে আগের জায়গায় ফিরে চলল হিপো। প্লেনটা অনেক নিচে নামিয়ে এনেছে সে। সার্চ লাইট জ্বেলে দিয়েছে। শক্তিশালী আলোকরশ্মি যেন রাতের অন্ধকার ফুঁড়ে গিয়ে সাগরের পানিতে পড়েছে।

'এই এই, ডানে দেখ!' চিৎকার করে উঠল অনিক। নিজের পাশের জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে আছে সে।

উজ্জ্বল কমলা রঙের একটা প্লাস্টিকের বয়া অনিকও দেখতে পেল। পানিতে ঢেউয়ের মধ্যে ভাসছে। আড়াআড়ি আঁকা মানুষের হাড়ের ওপর একটা খুলি আঁকা। 'ক্রসবোনের ওপর মানুষের খুলি! জলদস্যুদের প্রতীক!' উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল সে, 'ঠিক জায়গাতেই এসেছি আমরা। আমার ধারণা, জাহাজ নিয়ে চলে গেছেন জনসন। বয়া ভাসিয়ে চিহ্ন দিয়ে রেখে গেছেন যাতে ঠিক জায়গাটায় আবার ফিরে আসতে পারেন।'

'যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার,' আবীর বলল। 'জনসন আমাদের বলেছেন, সব সময় মারমেড প্রিন্সেসের কাছে নোঙর করে থাকে তাঁর জাহাজ। কখনও সরে না। পাহারা দেয়। সরলে চোর-ডাকাতেরা এসে গুপ্তধন তুলে নিয়ে যেতে পারে।'

'তাহলে জাহাজটা এখন কোথায় গেল?' একই জায়গায় চক্কর দিতে দিতে প্রশ্ন করল হিপো।

'হয়তো মনিকার ভূত এসে তুলে নিয়ে গেছে জাহাজটাকে,'

রসিকতা করল আবীর।

'ভূতে যে জাহাজ গায়েব করে দিতে পারে, এটা আমি অবিশ্বাস করি না,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল হিপো। 'কিন্তু ভূতে নিলে, এখানে বয়া ভাসিয়ে চিহ্ন ফেলে যেত না, তাই না?'

'একটা জবাবই মাথায় আসছে এখন আমার,' চিন্তিত ভঙ্গিতে অনিক বলল, 'কাজটা মানুষেরই। হয় জাহাজটাকে চুরি করে নিয়ে গেছে কেউ। কিংবা কিছুক্ষণের জন্য ধার নিয়েছে।'

'জাহাজ ধার নিয়েছে মানে?' আবীরের প্রশ্ন।

'কয়েক ঘণ্টার জন্য অন্য কোনো কাজ করতে নিয়ে গেছে।'

'কে নেবে?'

'জানি না!' বয়ার কালো রঙের ক্রসবোনটার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল অনিক। 'তবে একটা কথা বুঝতে পারছি, এই এলাকার পানিতে গভীর কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে।'

এগারো

'এক কাজ করলেই পারি,' হিপো বলল। 'এখানকার সমুদ্রের আরও অনেকখানি জায়গায় চক্কর দিয়ে দেখতে পারি জাহাজটা চোখে পড়ে কিনা।'

'দেখ, প্লেন নিয়ে বেশি ডিগবাজি খাসনে,' সাবধান করে দিল আবীর। 'প্লেনটা হাতে পেয়ে তো একেবারে বাহাদুর বনে গেছিস। তোর এই বার বার ওঠানামার পেটের মধ্যে মোচড় মারছে আমার। বমি করে ভাসিয়ে ফেলব বলে দিলাম।'

'হয়েছে, আর ইয়ার্কি মারা লাগবে না,' হিপো জবাব দিল। 'তোর হাতে কন্ট্রোল ছেড়ে দিলে তুই আরও বেশি করবি।'

প্লেনটাকে উত্তরে উড়িয়ে নিয়ে চলল হিপো। পানিতে একটা বিলাসবহুল ইয়ট চোখে পড়ল তার। ডেকের ওপর পার্টি চলছে। বলল, 'মাঝে মাঝে ভাবি, ধনী হওয়াটা সত্যিই বড় সুখের।'

'ধনীদের টাকাও বেশি, সমস্যাও বেশি,' দার্শনিক উক্তি করল অনিক। 'ম্যাসন মোঁপার কথাই ভাব।'

'কদলীমানব!' রসিকতা করল আবীর।

ইয়টটার পর আর কোনো জলযান চোখে পড়ল না ওদের। ম্যাপের দিকে তাকাল অনিক। স্কেলিটন রীফের দক্ষিণাংশে যেখানে হোয়াইট সোয়ানের থাকার কথা, সেজায়গাটাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। উত্তর দিকটা দেখল। দক্ষিণ আর উত্তরাঞ্চলের মাঝখানে বেশ অনেকখানি জায়গা ফাঁকা। সেদিকে যেতে বলল হিপোকে।

'এই দেখ দেখ,' আবীর বলল, 'ডানে তাকা।'

রীফের উত্তরাংশের ওপর দিয়ে উড়ছে তখন প্লেন।

সামনে, সামান্য ডান কোণে একটা জলযান চোখে পড়ল অনিকের, দূর থেকে দেখতে হোয়াইট সোয়ানের মতই লাগছে। প্লেন আরও কাছে যাবার পর মাস্তুলে উড়তে দেখা গেল জলদস্যুদের জলি রোজার পতাকা। চেঁচিয়ে উঠল অনিক, 'আরে! ওটাই তো!'

জাহাজের সামনে গলুই থেকে সামান্য দূরে অন্ধকার পানিতে আলোর আভা দেখা যাচ্ছে।

'ডাইভিং লাইটের আলো।' আবীর বলল। প্লেনটা জাহাজের ওপর দিয়ে পার হয়ে এলে জিজ্ঞেস করল, 'ডেকে কাউকে দেখেছিস?'

'না,' জবাব দিল আবীর।

'আবার ফিরে যাচ্ছি,' হিপো বলল। 'ভাল করে তাকাবি এবার। অন্ধকারেই যা দেখার দেখে নিবি। ল্যান্ডিং লাইট জ্বালাব না। ওরা তাহলে বুঝে ফেলবে ওদের খুঁজতেই এসেছি।'

অনেক জায়গা নিয়ে হোয়াইট সোয়ানকে ঘিরে বিশাল এক চক্কর দিল হিপো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে অনিক। পেশিবহুল দুজন লোককে বসে থাকতে দেখল জাহাজের টপ ডেকে। 'নুশান আর অ্যান্থনি। কোনো সন্দেহ নেই।'

ভালমত দেখার জন্য জানালার কাঁচে কপাল চেপে ধরেছে অনিক। 'পানিতে এখনও আলো দেখা যাচ্ছে। নুশান আর অ্যান্থনির পরনে ডুবুরির পোশাক নেই। ওরা বসে পাহারা দিচ্ছে। অন্য কেউ নেমেছে পানির নিচে।'

'ভাবছি, কে নামল?' আবীরের প্রশ্ন।

'আরেকটা রহস্য,' অনিক বলল। 'হিপো, আরেক চক্কর দে তো। ওই দুই ভাই ছাড়া ডেকে আর কেউ আছে কিনা দেখব।'

'আরেকটু নিচে নামাই, কি বলিস?' হিপো বলল। 'ওরা মনে করবে, আধুনিক জাহাজের মাস্তুলে জলদস্যুর পতাকা দেখে কৌতূহল হয়েছে আমাদের। সেকারণেই চক্কর মারছি।'

চক্কর দেয়ার সময় প্লেনের একপাশের ডানা সামান্য কাত করে ফেলল হিপো। নেমে এল যতটা সম্ভব নিচে। ডেকের ওপরটায় তন্নতন্ন করে খুঁজল অনিকের চোখ। কিন্তু দুই ভাইকে ছাড়া আর কাউকে চোখে পড়ল না। আবার যখন টপ ডেকে ফিরে গেল তার দৃষ্টি, দেখল ওদের দিকে রাইফেল তুলছে অ্যান্থনি আর নুশান।

'হিপো, সাবধান!' চেঁচিয়ে উঠল অনিক। 'ওরা আমাদের দিকে রাইফেল তাক করছে।'

অনিকের কথা শেষও হলো না, পর পর দুটো গুলির শব্দ হলো।

চোখের পলকে প্লেনের ডানা প্রায় নব্বই ডিগ্রি কাত করে ফেলল হিপো। একপাশে পুরোপুরি কাত হয়ে গেছে এখন বিমানটা।

'কী করছিস?' চেঁচিয়ে উঠল আবীর। প্লেন আচমকা কাত হয়ে যাওয়াতে কেবিনের দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছে সে।

'ঠিকই করছে,' অনিক বলল। 'গুলি থেকে বাঁচতে চাইছে হিপো। প্লেনের ইঞ্জিন কিংবা তেলের পাইপে গুলি লাগলে সর্বনাশ হবে। ভীষণ বিপদে পড়ে যাব আমরা।'

আরও দুটো গুলির শব্দ হলো। একটা গুলি বিইইং শব্দ তুলে আবীরের নিচের ডানাটা ভেদ করে চলে গেল। চোখমুখ কুঁচকে ফেলল সে। চিৎকার করে উঠল, 'প্লেনের গায়ে গুলি লেগেছে!'

'চুপ করে বসে থাক!' হিপো বলল। 'নড়াচড়া একদম করবি না! সামলাতে পারব না কিন্তু তাহলে।'

প্লেনটাকে আবার সোজা করে ফেলল সে। প্লেনের গতি বাড়িয়ে দিয়ে কোণাকুণি তীব্র গতিতে ওপরে উঠে যেতে থাকল। আচমকা এই গতির পরিবর্তনে পেটের ভিতর অদ্ভুত এক শূন্যতা অনুভূত হলো আবীরের।

অনেক ওপরে উঠে প্লেনটাকে আবার সোজা করে ফেলল হিপো। 'হয়েছে, এবার শান্ত হয়ে বসতে পারিস। গুলির সীমানার বাইরে চলে এসেছি।'

'সার্কাসের দড়াবাজিকরের খেল দেখালিরে হিপো!' পেটের ভিতরের শূন্যতা ঠিক হয়ে আসছে আবীরের।

'তাহলে স্বীকার করছিস, আমি তোদের চেয়ে ভাল চালাই?' জবাবের অপেক্ষা করল না হিপো। অন্য প্রসঙ্গে গেল। 'ওরা ভেবেছে ওদের ওপর গুপ্তচরগিরি করছি আমরা। ভাগ্যিস, ওরা জানে না প্লেনের মধ্যে আমরা আছি।'

'অত শিওর হোস না,' অনিক বলল। 'হতে পারে, হোয়াইট সোয়ানের টপ ডেকে এখন যারা বসা, কিংবা পানিতে ডুব দিয়েছে যারা, তাদেরই একজন আমাদেরকে ওই কালো বৃত্ত আঁকা মেসেজটা পাঠিয়েছে। আমাদের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রেখেছে সে।'

'শিওর; রহস্যময় কোনো কিছু ঘটছে এখন ওই পানির নিচে।' পানির নিচ থেকে যেখানে আলোর আভা আসছে সেই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে আছে আবীর।

'রহস্যময় যে তাতে তো কোনো সন্দেহই নেই,' অনিক বলল। 'কিন্তু সেই রহস্যটা কী?'

প্লেনের নাক পূর্বদিকে ঘুরিয়ে দিল হিপো। 'কোনো কারণে স্কেলিটন রীফের উত্তর দিকে নিয়ে আসা হয়েছে হোয়াইট সোয়ানকে। আমার প্রশ্ন হলো, পানিতে নেমে ডুব দিচ্ছে কেন? শুধুই বিনোদনের জন্য? মনে হয় না। আমার ধারণা, কোনো কিছু খুঁজছে ওরা এখানে।'

'গতরাতে যখন ডিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমাদের, কি বলেছিল মনে আছে?' আবীরের প্রশ্ন। 'বলেছিল ভাঙা জাহাজে ভর্তি হয়ে আছে এখানকার সাগরতল।' আবীর অনুমান করল, 'হয়তো জলদস্যুদের আরেকটা জাহাজের খোঁজ পেয়েছে ওরা। ওটাতেও গুপ্তধন ভর্তি। সরকারকে জানালে ভাগ দিতে হবে। সেকারণেই বেআইনীভাবে গোপনে এখন রীফের ওই জায়গায় ডুব দিচ্ছে ডুবুরিরা।'

'বেআইনী কোনো কিছু যদি ঘটেই থাকে এখানে, আর সেটা জেনে যায় কারিনা...' আনমনে নিজের মনের ভাবনাটা প্রকাশ করতে গিয়ে হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়ে থেমে গেল অনিক। তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'দাঁড়া দাঁড়া! হোয়াইট সোয়ান এখন যেখানে,

গতকাল রাতেও যদি এখানে এসে থাকে, তাহলে এখানেই কারিনাকে জাহাজ থেকে ফেলে দেয়া হয়েছে। কারিনাকে যেখানে পেয়েছি আমরা, সেখান থেকে উত্তরে রয়েছে এখন জাহাজটা। স্রোত বইছে দক্ষিণে। মিলে যাচ্ছে অনেক কিছু। চিন্তা করার ভাল একটা খোরাক পাওয়া গেল।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস,' আবীর বলল। 'রহস্যময় খোরাক।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই এয়ারপোর্টের ওপরের আকাশে পৌঁছে গেল হিপো। ল্যান্ড করার প্রস্তুতি নিতে লাগল। মাটি স্পর্শ করল প্লেনের চাকা। কিছুটা এগোনোর পর রানওয়ে থেকে সরে এল কংক্রীটের তৈরি একটা রাস্তার মত জায়গায় যেখানে হালকা বিমানগুলো পার্ক করে রাখা হয়। ধাতব দেয়ালে তৈরি বেশ কয়েকটা হ্যাঙ্গার দেখা যাচ্ছে রাস্তার পাশে। তার ওপাশে সবুজ বনানী।

প্লেনটা পার্ক করে রাখল হিপো। নেমে এল তিনজনে। প্রথমে আবীরের চোখে পড়ল লোক দুজনকে। রাস্তার উল্টোদিকে হালকা একটা সুদর্শন বিমানের পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। একজন লোকের ওপর স্থির হয়ে গেল তার দৃষ্টি। পরক্ষণে বলে উঠল, 'আরে, জনসন না?'

'হ্যাঁ, তাই তো,' অনিক জবাব দিল।

অনিক, আবীর, হিপো তিনজনেই তাকিয়ে আছে জনসনের দিকে। নেভি ব্লেজার আর সাদা প্যান্ট পরা সাদাচুলো একজন লোকের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। দোমড়ানো একটা সুটকেস খুলে ভিতর থেকে কতগুলো পানিভর্তি প্লাস্টিকের ব্যাগ বের করলেন। একটা ব্যাগের মুখের বাঁধন খুলে ভিতর থেকে ছোট একটা জিনিস তুলে নিলেন। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় ঝিক করে উঠল জিনিসটা।

'সোনা!' চিৎকার করে উঠতে গিয়েও সামলে নিল হিপো। 'অন্য

কোনো ধাতু আলোতে এরকম চমকাবে না। মারমেড প্রিন্সেসের জিনিস না তো?'

'আমার মনে হয় না,' জবাব দিল অনিক। 'ওখানকার জিনিস এখানে আনতে পারবেন না ক্যাপ্টেন। হিউয়েন রডরিক আনতে দেবেন না।'

'কিন্তু সবকিছুর ওপর কড়া নজর রেখেও মারজি পিটম্যানকে ঠেকাতে পারেননি রডরিক,' আবীর বলল। 'চল, কাছে গিয়ে দেখি।'

সরাসরি এগোলে ওদের দেখে ফেলবে, তাই রাস্তার পাশের গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে থেকে এগিয়ে চলল তিনজনে। জনসনদের একেবারে কাছে চলে এল ওরা। গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে নজর রাখল।

ব্যাগ থেকে জিনিসগুলো বের করে একটা প্লেনের ডানার ওপর রাখতে লাগলেন জনসন। জিনিসগুলো চিনতে পারছে আবীর। সোনা আর রূপার মুদ্রা, সোনার বিস্কুট, চায়ের কাপের ভাঙা টুকরো, একটা অ্যানটিক পিস্তল, কতগুলো রূপার বল, ড্রাগনের লকেট লাগানো একটা রূপার চেন।

ফিসফিস করে আবীর বলল, 'কী কাণ্ড! ওগুলো আজ রাতে মারজিকে মাটিতে পুঁতে রাখতে দেখেছিলাম।'

'তাহলে জনসনের কাছে এল কী করে?' অনিকের প্রশ্ন।

'মারজির কাছ থেকে,' আবীর বলল। 'হয়তো মারজিই জিনিসগুলো চুরি করে জনসনকে দিয়েছে। সরকারের নিয়ম-নীতি মেনে কয়েক বছর অপেক্ষা করতে মনকে মানাতে পারছেন না নিশ্চয় জনসন। তাই চুরি করে এনে আগেই গোপনে বেচে দিচ্ছেন। যাই হোক, তাঁকে দোষ দিতে পারছি না। পুরো চারটে বছর ওগুলোর পিছনে গাধার খাটনি খেটেছেন তিনি। কত আর অপেক্ষা করবেন?

তা ছাড়া সব খাটনি নিজে করার পর শুধুমাত্র বিশ পার্সেন্ট নিয়ে খুশি থাকতে পারছেন না হয়তো তিনি।'

'কিন্তু নিজের উদ্ধার করা জিনিস নিজেই চুরি করছেন?' মানতে পারছে না অনিক। প্লেনের ডানায় রাখা গুপ্তধনগুলোর দিকে চোখ। গভীর মনোযোগে জিনিসগুলো পরীক্ষা করছেন সাদা চুলওয়ালা ভদ্রলোক। জলদস্যুর গুপ্তধন দেখে অভিভূত।

'ক্যাপ্টেন হয়েছেন বলেই যে লোভী হয়ে উঠবেন না, এমন কোনো কথা নেই। হাজার হোক মানুষ তো,' আবীর বলল। 'তা ছাড়া সত্যিকারের বিচারে ওসব জিনিসের ওপর অধিকার অন্য যে কারও চেয়ে তাঁরই বেশি।'

'কী জানি, জলদস্যুতার প্রতি তাঁরও মোহ থাকতে পারে,' হিপো বলল। 'তিনি নিজেই হয়তো আধুনিক জলদস্যু। দেখতে কিন্তু ডাকাতের মতই লাগে।'

'কিংবা হয়তো আসল কথাটা না জেনেই আজেবাজে সব ধারণা তৈরি করে নিচ্ছি আমরা মনের মধ্যে,' অনিক বলল।

আচমকা ঘুরে দাঁড়ালেন জনসন। বনের দিকে তাকালেন। যেখানে লুকিয়ে আছে গোয়েন্দারা।

'সাবধান!' ফিসফিস করে বলল হিপো। 'নড়বি না!'

'না, নড়ছি না!' জবাব দিল অনিক।

এত নিচু স্বরে কথা বলেছে ওরা, তারপরেও মনে হলো শুনে ফেললেন জনসন। আচমকা ফিরে তাকালেন ঝোপের দিকে। সন্দেহ করেছেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলেন, যেন দিগন্তে জাহাজ খুঁজছে তাঁর চোখ। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই, কে ওখানে? বেরিয়ে এসো বলছি। এসো। বেরোও।'

'বেরোবি না!' ফিসফিস করে বলল আবীর। 'দেখতে এলে

আসুক। আমরা তিনজন, জনসন একা, অত ভয় পাই না।'

এইবার মনে হলো ভালমতই শুনলেন জনসন। ধমকে উঠলেন, 'কি, কথা কানে যাচ্ছে না?' প্যান্টের পিছনে চলে গেল তাঁর ডান হাত। আবার যখন সামনে এল, দেখা গেল হাতে একটা পিস্তল। ঝোপের দিকে তুলে ধরে চেঁচিয়ে বললেন, 'এখনও সময় আছে, বেরোও বলছি! জলদি বেরোও!'

পিস্তলের সেফটি ক্যাচ অফ করে দিলেন তিনি। গুলি করতে প্রস্তুত।

বারো

'গুলি করবেন না! বেরোচ্ছি!' জবাব দিল আবীর। দুই হাত মাথার ওপর তুলে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল।

'আরে, আবীর!' জনসন অবাক। 'কল্পনাই করিনি তোমরা! তোমার পিছনে আর কে কে আছে? বেরোতে বলো। আমার হাত কিন্তু নিসপিস করছে ট্রিগার টেপার জন্য।'

আর লুকিয়ে থাকার মানে হয় না। অনিক আর হিপোও হাত তুলে বেরিয়ে এল। নার্ভাস ভঙ্গিতে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে সাদাচুলো লোকটা।

'উনি হার্বার্ট,' আবীরের ওপর পিস্তল তাক করে রেখে লোকটার পরিচয় দিলেন জনসন। 'এখন বলো তো, লুকিয়ে থেকে আমাদের ওপর ওভাবে নজর রাখছিলে কেন তোমরা?'

'আমাদের এই বন্ধুটি,' হিপোকে দেখাল আবীর, 'ওর নাম

হিপো। ওর চাচার একটা প্লেন আছে। ওটা নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম আমরা।'

'তাই?' হিপোর দিকে পিস্তল তাক করলেন জনসন। 'তাহলে ঘোরা বাদ দিয়ে আমার ওপর গোপনে নজর রাখছিলে কেন?'

'আসছি সেকথায়,' শান্তকণ্ঠে অনিক জবাব দিল। 'প্লেন থেকে নামতেই আপনাদের দেখলাম। ব্যাগ থেকে কিছু খুলে ওই ভদ্রলোককে দেখাচ্ছিলেন। কী দেখাচ্ছেন, কৌতূহল হলো। দেখতে এলাম।'

'কি দেখাচ্ছিলাম, দেখেছ?' জনসন জানতে চাইলেন।

'না, ঠিক দেখিনি,' অনিক জবাব দিল।

'ঠিক দেখনি মানে?' প্রায় গর্জে উঠলেন জনসন। 'দেখো অনিক, আমাকে সত্যি কথা বলো!'

জনসনকে ফাঁকি দেয়া যাবে না বুঝে আর সেই চেষ্টা করল না অনিক। বলল, 'এই ভদ্রলোককে আপনি মারমেড প্রিন্সেসের রেলিকগুলো দেখাচ্ছিলেন।'

'হুঁ,' হাসলেন জনসন। 'আর তোমরা মনে করেছ এগুলো আমি চুরি করে এনেছি, তাই না?'

'চুরি করেছেন, বলিনি।'

'কিন্তু আমি সত্যিই চুরি করেছি,' জনসন জবাব দিলেন। 'একটু আগে আমি ভেবেছিলাম ওগুলো আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে এসেছ তোমরা। কিন্তু এখন বুঝলাম ভুল করেছি।'

'যাক, শুনে খুশি হলাম,' হিপো বলল।

পিস্তল নামালেন জনসন। সেফটি ক্যাচ অন করে দিলেন। তারপর ভরে রাখলেন প্যান্টের পিছনের পকেটে।

হাঁপ ছাড়ল ছেলেরা। হাত নামিয়ে নিল। রুমাল বের করে

কপালের ঘাম মুছতে শুরু করল সাদাচুলো লোকটা।

'হার্বার্ট,' সাদাচুল লোকটার দিকে ফিরে তাকালেন জনসন। 'আপনি থাকুন। জিনিসগুলো পাহারা দিন। আমার দেরি হবে না।' হাত নাড়লেন হার্বার্ট। ছেলেদের দিকে ফিরলেন আবার জনসন। 'হ্যাঁ, বলো।'

'সার,' আবীর বলল, 'কেন একাজ করেছেন, জানতে পারি?'

'ইয়ে...' হাত দিয়ে এক গোছা চুল পিছনে সরিয়ে দিলেন জনসন। 'দেখেই যখন ফেলেছ, তোমাদের কাছ থেকে কথাটা আর গোপন করার কোনো মানে হয় না।'

'তারমানে আরও গোপন কথা আছে আপনার,' বিড়বিড় করল হিপো।

'এসো আমার সঙ্গে,' জনসন বললেন। বলে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি। ঘন গাছপালার ভিতর ঢুকে পড়লেন। পাহাড়ে উঠতে লাগলেন। ছেলেরা অনুসরণ করল তাঁকে।

পাথরের একটা তাকমত জায়গায় এসে দাঁড়ালেন জনসন। দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তটা দেখা যায় এখান থেকে।

'বালির নিচ থেকে জিনিসগুলো যখন তুলতে শুরু করলাম আমরা,' সাগরের দিকে তাকিয়ে বললেন জনসন, 'বুঝে গেলাম, শুধু টাকা উপার্জনের জন্য জিনিসগুলো বিক্রি করে দেয়াটা মোটেও উচিত কাজ হবে না। নিজেকে বোঝালাম, ইমবি, ওকাজও কোরো না। এত সুন্দর জিনিস, মিউজিয়ামে রাখার উপযুক্ত। লোকে দেখবে, মুগ্ধ হবে। জলদস্যুরা কেন জলদস্যু হয়েছে জেনে মন খারাপ করবে।'

'জলদস্যুদের কথা ভেবে কারও মন খারাপ হয় না,' জনসনের দিকে তাকিয়ে আছে আবীর। 'কামান বসানো জাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ানো কতগুলো গলাকাটা ডাকাত, নিরীহ মানুষের জাহাজের ওপর

চড়াও হয়ে ডাকাতি করে সব কেড়ে নিত, ওদের জন্য আবার দুঃখ হবে কার!'

'উঁহু, কিছুই জানো না তুমি,' জনসন বললেন। 'ওরা নিষ্ঠুর ছিল, কোনো সন্দেহ নেই, তবে মূলত ওরা ছিল বিদ্রোহী। ওদের অবস্থায় পড়লে তোমরাও নিষ্ঠুর হতে। ওই আমলে বেশির ভাগ মানুষই ছিল অসম্ভব গরীব। দুনিয়ার কোনোখানে গণতন্ত্র বলে কিছু ছিল না। জোর যার মুল্লুক তার, এই ছিল অবস্থা। জলদস্যুরা এই অবস্থার পরিবর্তন চেয়েছিল, সমাজে কিছুটা সমতা আনতে চেয়েছিল, এটাই ছিল ওদের দোষ। তখনকার ধনীরা ওদের ডাকাত হতে বাধ্য করেছিল। লোভী আর শয়তান বলে ওরা ডাকাতি করত, ব্যাপারটা মোটেও তা ছিল না। ডাকাতি শুরু করেছিল ওরা না খেয়ে মরা থেকে বাঁচার জন্য।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন জনসন। 'জলদস্যুদের জাহাজ। হয়তো ভাবছ, অনাচার আর অবিচারের ছড়াছড়ি ছিল ওগুলোতে। কিন্তু সত্যি কথাটা হলো, গণতন্ত্র পুরোমাত্রায় বহাল ছিল ওই জাহাজগুলোতে। সব ধরনের মানুষের সঙ্গে একই আচরণ করা হতো। ভোটের মাধ্যমে ক্যাপ্টেন নির্বাচন করা হতো। কোনো ক্যাপ্টেনকে যদি অযোগ্য মনে হতো, ভোটের মাধ্যমেই আবার তাকে নামিয়ে দেয়া হতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল অতিমাত্রায় যোগ্য। রেড বিয়ার্ড ছিল সেরকম একজন ক্যাপ্টেন। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে প্রথম বক্তৃতাতেই বলেছিল: বন্ধুগণ, তোমরা কেউ আর ধনীদের চাকর নও, সবাই সমান। এখন থেকে সবাই তোমরা মুক্ত, স্বাধীন মানুষ। এধরনের কথা যারা বলতে পারে, তারা কীরকম মানুষ নিজেরাই কল্পনা করে নাও।'

'আশ্চর্য!' বলল বিস্মিত আবীর। 'জলদস্যুদের সম্পর্কে শুধু খারাপ খারাপ কথাই শুনে এসেছি এতদিন। এসব ইতিহাস কেউ কোনোদিন বলেনি আমাদের।'

'আমিও শুনিনি,' অনিক বলল।

'তারমানে জলদস্যুদের একটা মিউজিয়াম হচ্ছে?' উৎসাহের সঙ্গে জানতে চাইল হিপো। 'ভালই হবে। কবে খোলা হচ্ছে, জানাবেন। ওই মিউজিয়ামের পয়লা দর্শক হব আমি।'

গাল চুলকালেন ক্যাপ্টেন। 'সমস্যাটা হলো, টাকা। মিউজিয়াম করতে অনেক টাকা লাগে। ম্যাসন মোঁপাকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু সোজা জানিয়ে দিল, টাকা নেই। বরং উল্টো আমার কাছে টাকা চেয়ে বসল। বলল, যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কিছু রেলিক বিক্রি করে তাকে টাকা দিতে পারলে বেঁচে যায়। কলার ব্যবসা ভাল না। ভীষণ টাকার টানাটানিতে আছে।'

'তাহলে ম্যাসনের শেয়ারটা অন্য কারও কাছে বিক্রি করে দিচ্ছেন না কেন?' অনিক বলল। 'তাতে ম্যাসনেরও টাকার সমস্যার সমাধান হবে, আপনিও মিউজিয়াম বানাতে পারবেন।'

'সেই চেষ্টাই করছি এখন,' জনসন বললেন। 'হার্বার্ট একজন ধনী ব্যবসায়ী। মিউজিয়াম বানানোর সামর্থ্য আছে। সেজন্যই তো রেলিকগুলো হাতে করে নিয়ে এসেছি তাকে দেখানোর জন্য।'

'আপনি কষ্ট করে এগুলো না এনে তাঁকে জাহাজে নিয়ে গেলেই পারতেন?' অনিক বলল, 'তাতে ঝামেলাও বাঁচত, এসব লুকোচুরি খেলারও কোনো প্রয়োজন পড়ত না।'

'কী করে জানব কবে রেলিক পাওয়া যাবে? সবদিন তো আর পাই না। মাঝে মাঝে এমনও হয়, হপ্তার পর হপ্তা কিছু পাই না।

হার্বার্ট ব্যস্ত মানুষ, হাজারটা কাজ; কবে রেলিক পাব না পাব সেই আশায় তো আর জাহাজে গিয়ে বসে থাকতে পারবে না। যেদিন পাই, খবর দিই। এসে দেখে যায়। আজকের মত।'

'রডরিককে বলে জিনিসগুলো ধার নিলেও পারতেন?' হিপোর প্রশ্ন। 'হার্বার্টকে দেখানোর পর নাহয় আবার ফেরত দিতেন?'

'তুমি কি ভেবেছ সে-চেষ্টা করিনি? সরকারি লোকটাকে কত অনুরোধ করলাম। বোঝানোর চেষ্টা করলাম। উল্টো ফল হলো তাতে। আমাদের ওপর সন্দেহ জাগল। আরও বেশি সতর্ক নজর রাখতে শুরু করল। বাধ্য হয়ে এব্যবস্থা করতে হয়েছে।'

'অর্থাৎ, চুরি,' আবীর বলল। 'জাহাজ থেকে সরালেন কী করে এগুলো?'

'মারজিকে দিয়ে,' হাসিমুখে জবাব দিলেন জনসন। 'মেয়েমানুষের অনেক গুণ। দিব্যি রডরিকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে জাহাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে। নিজের বাড়িতে বসে রেলিকের ওপরে লেগে থাকা আবরণ পরিষ্কার করে। পানির ব্যাগে ভরে মাটিতে পুঁতে চিহ্ন দিয়ে রাখে। সময়মত আমি গিয়ে চিহ্ন দেখে জিনিসগুলো তুলে আনি। হার্বার্টকে দেখাই। ব্যাপারটাকে চুরি না বলে এক ধরনের দস্যুতা বলতে পারো। তবে সত্যি বলতে কী, মজা পাই আমি। এক ধরনের রোমাঞ্চ অনুভব করি।'

'হার্বার্টকে দেখানোর পর জিনিসগুলো কী করেন?' আবীর জিজ্ঞেস করল।

'যেখানকার জিনিস সেখানে ফিরিয়ে দিয়ে আসি,' হাসিটা চওড়া হলো জনসনের। 'চুরি করে আনি বটে, কিন্তু কারও কাছে বেচি না।'

'আর একটামাত্র প্রশ্ন করব,' অনিক বলল। 'সাথে পিস্তল রাখেন কেন?'

'এ কোনো প্রশ্ন হলো? আজ রাতে কত টাকার জিনিস এনেছি জানো? কম করে হলেও এক লাখ ডলারের। কেউ এসে যদি কেড়ে নিতে চায়, পিস্তল দেখানো ছাড়া উপায় কী? নীল আর কোয়ান তো আমার পিছে লেগেই আছে। তোমাদেরকে আসলে তখন ওরা ভেবেছিলাম। সেজন্যই পিস্তল তুলে হুমকি দিয়েছিলাম।'

'গুলি যে করেননি,' হিপো বলল, 'এই আমাদের সাত কপালের ভাগ্য।' তার কথাটাতে ব্যঙ্গ আছে কিনা বোঝা গেল না।

অন্য প্রসঙ্গে গেল আবীর। জনসনকে জিজ্ঞেস করল, 'ও হ্যাঁ, ভাল কথা, কারিনার কোনো খোঁজ পেলেন?'

'নাহ্!' গম্ভীর হয়ে গেলেন জনসন। 'বিস্ময়কর মনে হচ্ছে আমার কাছে, এভাবে তার উধাও হয়ে যাওয়াটা। কোথায় যে গেল! খুব ভাল মেয়ে। দোয়া করি, ভাল থাকুক।'

'আমরাও করি,' নিচের অন্ধকার সাগরের দিকে তাকিয়ে বলল অনিক। 'যেখানেই থাকুক, ভাল থাকুক।'

'যাই। হার্বার্ট অপেক্ষা করছে।' আঙুল ফোটালেন জনসন। 'মিউজিয়ামের ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাচ্ছে। বেশিক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলে রেগে যেতে পারে। আমার গোপন কথাগুলো আশা করি গোপনই রাখবে তোমরা, কাউকে বলবে না?'

'না,' জবাব দিল আবীর, 'কাউকে বলব না আমরা।'

'যাক, শুনে ভাল লাগল,' টুপির কানা টেনে নিচে নামিয়ে আবার উপরে তুলে দিলেন জনসন। 'কোনো একদিন হয়তো আমার পাইরেট মিউজিয়ামে দেখা হবে তোমাদের তিনজনের সাথে, যেটার স্বপ্ন দেখছি আমি এখন। আচ্ছা, চলি। ইয়ো হো হো অ্যান্ড আ...' থেমে গেলেন। বোধহয় জলদস্যুদের শুভেচ্ছাবার্তা 'বটল্ অভ রাম' বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তা না বলে বললেন, 'বটল্ অভ সোডা।'

তারপর আরও একবার আঙুল ফুটিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে রওনা হয়ে গেলেন এয়ারপোর্টের দিকে।

'কথাগুলো যা বললেন, সত্যি বলে গেলেন তো?' হিপোর প্রশ্ন।

'মনে তো হচ্ছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল অনিক।

'যদি সত্যি কথাই বলে গিয়ে থাকেন,' আবীর বলল, 'তাহলে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি তাঁকে। মারজিকে চুরি করতে যদি দেখেও ফেলে কারিনা, বুঝিয়ে বললে বুঝবে সে। সেক্ষেত্রে জনসন কিংবা মারজির আর কারিনাকে খুন করে মুখ বন্ধ করার দরকার পড়বে না।'

'আমি বলি কী,' হিপো বলল, 'আপাতত কারিনার চিন্তা বাদ দিয়ে রীফের উত্তর দিকে হোয়াইট সোয়ান কী করছে সেটা জানার চেষ্টা করি। আমার মনে হচ্ছে, জানাটা জরুরী। সন্দেহজনক কিছু করে থাকলে জাহাজে যারা আছে এখন, তাদেরকেই বরং সন্দেহ করা উচিত।'

'ঠিক বলেছিস,' ঘড়ি দেখল অনিক। 'তবে এখন আর সম্ভব না। বারোটার বেশি বাজে। এখানে আর দাঁড়িয়ে না থেকে বাসায় চল। রাতটা ঘুমিয়ে কাল সকালে তাজা শরীর নিয়ে আবার শুরু করব।'

'হ্যাঁ, চল,' হাই তুলল আবীর।

*

পরদিন সকাল। ঝলমলে রোদ। দ্বীপের পাহাড়গুলোর অসংখ্য সবুজ ঢালের একটা বেয়ে জীপ চালাচ্ছে আবীর। সে আর অনিক চলেছে দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের ক্যাস্ট্রিজ নামে একটা গ্রামের দিকে। স্কেলিটন রীফের উত্তর দিকে কিছু আছে কিনা ওখানকার লাইব্রেরিতে খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করবে। কারিনাকে খোঁজার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে

হিপোকে। রেন্ট-আ-কার থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে আরেক দিকে চলে গেছে সে।

খবরের কাগজ, নতুন বই আর চামড়ায় বাঁধানো পুরানো বইয়ের ভলিউম ঘেঁটে লাইব্রেরিতে তিনটে ঘণ্টা ব্যয় করল দুজনে। বহু পুরানো জাহাজের খোঁজ পেল, এক সময় রীফের উত্তর দিক ঘেঁষে যাত্রাপথ ছিল যেগুলোর। কিন্তু এমন কোনো কিছুর খোঁজ পেল না, যেটা সন্দেহ জাগায়, যে সূত্রটা ওরা খুঁজছে।

'এভাবে পাব বলে মনে হয় না,' চোখ ডলতে ডলতে বলল আবীর। একটানা ছাপার অক্ষরের দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ ব্যথা করে ফেলেছে। 'মারমেড প্রিন্সেস কোথায় ডুবেছে–শুধু সেটুকু ধারণা পাওয়ার জন্য পুরো একটা বছর ব্যয় করতে হয়েছে জনসনকে। অথচ মাত্র কয়েক ঘণ্টা পড়েই কোনো কিছু পেয়ে যাব আমরা, আশা করাটাই পাগলমি। অকারণে কষ্ট না করে, চল, জানেশোনে এমন কাউকে খুঁজে বের করি। যে বলতে পারবে রীফের উত্তর ধারে মূল্যবান কিছু আছে কিনা।'

ঝটাৎ করে হাতের সামনের বইটা বন্ধ করে ফেলল অনিক। 'একজন পারবে, আমি জানি!'

'কার কথা বলছিস?' ভুরু কুঁচকাল আবীর।

'আন্টি গোয়েনি,' অনিক বলল। 'মনে নেই, আন্টি বলেছিল, দ্বীপে এমন কিছু নেই, যা তার অজানা? তাকে কোথায় পাওয়া যাবে, সেকথাও জানিয়ে রেখেছে আমাদের।'

'আগ্নেয়গিরির ভিতর,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল আবীর। 'এরকম একটা কথা ভুললাম কী করে!'

'চল চল। এখানে আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করার দরকার নেই।'

লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে তাড়াহুড়া করে জীপে উঠে বসল দুজনে। গাছপালায় ভরা বেশ কয়েকটা সবুজ খাড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এসে গাড়ি ছোটাল লা সোফ্রিয়ার আগ্নেয়গিরির দিকে। গাড়ি চালাচ্ছে আবীর। ম্যাপ দেখছে অনিক। কিন্তু কাঁচা রাস্তাগুলো ম্যাপে দেখানো নেই। খুব শীঘ্রি দ্বীপের এমন একটা নির্জন অংশে চলে এল ওরা, যেখানে গাছপালা কম। পুরো তিরিশটা মিনিট একজন মানুষ খুঁজে বেড়াল ওরা, যে ওদেরকে পথের ঠিকানা বলে দিতে পারে। কিন্তু একজন মানুষও চোখে পড়ল না। প্রচণ্ড হতাশ হলো। এত নির্জন জায়গাটা, কল্পনাই করা যায় না।

ঘুরতে ঘুরতে শেষে যখন হাল ছেড়ে দিতে বসেছে আবীর, ঠিক এই সময় একজন মানুষকে চোখে পড়ল অবশেষে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে এক বুড়ো। সাথে একটা খচ্চর। গলার রশি ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে।

লম্বা ঘাসে ছাওয়া পাহাড়ের চূড়ায় কয়েকটা ছাউনিমত কুঁড়েঘরও চোখে পড়ল অনিক-আবীরের। গাড়ি রেখে প্রায় ধাওয়া করার মত লোকটার পিছু নিয়ে উপরে উঠতে শুরু করল ওরা। বেশ গরম পড়েছে। দেখতে দেখতে ঘেমে নেয়ে গেল। দুই হাতে মশা তাড়াচ্ছে।

'এই যে, শুনুন,' ডাক দিল অনিক।

ফিরে তাকাল লোকটা। 'কী?'

'লা সোফ্রিয়ার আগ্নেয়গিরিটা খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা। কোনদিকে বলতে পারবেন?'

দাঁড়িয়ে গেল লোকটা। কাছে এল অনিক-আবীর। চোখভরা সন্দেহ নিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে খচ্চরটা। বুড়ো বলল, 'কাগজ-কলম আছে?'

'আছে,' অনিক বলল।

'দাও, এঁকে দেখিয়ে দিই।'

কলম আর কাগজ বের করে বাড়িয়ে দিল অনিক।

বুড়োকে খাতির করার ভঙ্গিতে আবীর বলল, 'খচ্চরটাকে আদর করি?'

'না করলেই ভাল,' বুড়ো জবাব দিল। 'ভীষণ বদমেজাজী। অচেনা মানুষ দেখলেই কামড়াতে চায়।'

'ও!' ঝটকা দিয়ে বাড়ানো হাতটা সরিয়ে নিয়ে দুই হাতই প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল আবীর, খচ্চরের দাঁতের আওতার বাইরে।

কাগজে এঁকে দেখিয়ে দিল বুড়ো। কাগজটা অনিকের হাতে দিল। হাতে নিয়ে কাগজটার দিকে তাকাল অনিক।

'যাও, সহজেই পেয়ে যাবে এখন,' বুড়ো বলল। তারপর খচ্চরটাকে টেনে নিয়ে আবার পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল।

ঢাল বেয়ে নামা ওঠার চেয়ে অনেক সহজ। প্রায় দৌড়ে নামতে লাগল দুজনে। বুড়োর এঁকে দেয়া ছবি দেখে এখন আগ্নেয়গিরিটা খুঁজে বের করতে পারলে হয়।

পথে গোটা তিনেক সাদা ছাগলের পাশ কাটাল ওরা। শরীর-স্বাস্থ্য মোটেও ভাল না ছাগলগুলোর। অনিক বলল, 'পাহাড়ের ওপর যে কুঁড়েগুলো আছে, ওগুলোতে যারা থাকে নিশ্চয় তাদেরই ছাগল এগুলো। দুধ আর মাংসের জন্য পোষে।'

'জায়গাটা কী, দেখেছিস!' ভুরু থেকে ঘাম মুছতে মুছতে জবাব দিল আবীর। 'ওখানে যারা বাস করে, একেবারে আদিম। একবিংশ শতাব্দী থেকে নিশ্চয় বহুদূরে রয়েছে ওরা, অনেক পিছনে পড়ে আছে। তবে এখানে বাস করতে নিশ্চয় খুব মজা। থাকতে ইচ্ছে

করছে আমার।'

ফিরে তাকাল অনিক। 'তোর ইচ্ছেগুলো ভারি অদ্ভুত। এর আগে একবার ইয়টে থাকতে ইচ্ছে করছিল। এখন ইচ্ছে করছে ছাগলের সঙ্গে থাকার। মাঝে মাঝে না, আমার অবাক লাগে, তুই আসলে...'

চমকে থেমে গেল অনিক। মাথার হ্যাটের চাঁদি ছুঁয়ে চলে গেছে কী যেন। পিছনে ফিরে দেখে, একটা গাছের গায়ে বিদ্ধ হয়েছে লম্বা একটা ধাতব জিনিস। জিনিসটা ছোট আকারের বর্শা। চোখা মাথা। স্পিয়ারগান থেকে ছোঁড়া হয়েছে। পানির নিচে ডুব দিয়ে এই বর্শা দিয়ে মাছ শিকার করে ডুবুরিরা।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। গাছপালার ভিড়ের দিকে তাকাল। কেউ লুকিয়ে আছে কিনা দেখল। কিন্তু কোনো মানুষের ছায়াও চোখে পড়ল না।

এদিকে আরেকটা বর্শা ছুটে আসছে তখন ওর দিকে। তীব্র গতিতে। বিদ্যুৎ-ঝিলিকের মত।

তেরো

ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে পড়ল অনিক। বর্শাটা এসে বিঁধল মাটিতে তার কয়েক ফুট পিছনে।

'কী, হচ্ছে কী?' বন্ধুর পাশে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে জিজ্ঞেস করল আবীর।

'ছাগলগুলোর ওপাশ থেকে স্পিয়ারগান দিয়ে আমাদের দিকে স্পিয়ার ছুঁড়ছে কেউ,' অনিক বলল। 'মাথা বেশি উঁচু করিস না।

কোনদিক দিয়ে এসে ঘ্যাচ করে বিঁধে যাবে টেরও পাবি না।'

ফিরে তাকাল আবীর। সূর্যটা ওদিকে। রোদের ঝিলিমিলি। চোখে রোদ পড়ে। তাই ভালমত দেখা যায় না। কপালে হাত রেখে রোদ আড়াল করে তাকাল সে। ছাগলগুলোকে দেখতে পেল। গাছের জটলার কাছে চরে বেড়াচ্ছে। আশেপাশে পোকামাকড়ের গুঞ্জন ছাড়া আর কোনো শব্দই নেই।

হঠাৎ সেই গুঞ্জনের সঙ্গে আরেকটা গুঞ্জন মিশে গেল। পরক্ষণে বাহুতে খোঁচা লাগল তার। লম্বা ঘাসের মধ্যে মাটিতে বিঁধে যেতে দেখল বর্শাটাকে। বাহু ছুঁয়ে গেছে বর্শার চোখা ফলার একটা পাশ। আঁচড় লেগেছে।

'এখানে থাকলে মারা পড়ব!' চেঁচিয়ে বলল অনিক। লাফিয়ে উঠে দৌড় দিল সে। 'জীপের দিকে দৌড়া। এঁকেবেঁকে। যাতে নিশানা ঠিক রাখতে না পারে।'

এক মুহূর্ত দেরি না করে আবীরও ছুটল।

ঘাসের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে একটা কাঁচা রাস্তায় পৌঁছে গেল ওরা, যেখানে জীপটা রেখে গিয়েছিল। লাফ দিয়ে জীপে উঠে পড়ল দুজনে। ইগনিশনের চাবি মুচড়ে ধরল আবীর। খটাং করে আরেকটা বর্শা এসে লাগল জীপের পিছনের ফেন্ডারে। ফিরে তাকাল অনিক। এবারও সেই আগের মতই অবস্থা। কোনো মানুষ চোখে পড়ল না। শুধু গাছপালা, ঘাস আর ছাগল।

অ্যাক্সিলারেটর চেপে ধরল আবীর। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল জীপ। কাঁচা রাস্তায় ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটল। এতক্ষণে কথা ফুটল তার মুখে, 'আরেকটু হলেই শিক কাবাবের মত গেঁথে ফেলেছিল আমাকে!'

'তোকে একা না,' অনিক বলল। 'আমাকেও।'

'কার কাজ, বল তো?' আবীরের প্রশ্ন।

'আমাদেরকে কালো বৃত্ত পাঠিয়েছিল যে লোক, হয়তো সে-ই। সারা সকাল ধরেই আমাদের পিছু নিয়েছিল কেউ। সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।' আবার ফিরে তাকাল অনিক। পিছনের রাস্তাটা দেখল। 'এখন অবশ্য কাউকে দেখছি না।'

'আজ হলো শনিবার,' সামনের রাস্তার দিকে আবীরের চোখ। একটা খাড়াই বেয়ে নামছে। 'হোয়াইট সোয়ানের নাবিকদের আজকে সাপ্তাহিক ছুটি। সুতরাং ওদের যে কেউ আমাদের পিছু নিতে পারে। নেবার সুযোগ আছে। স্পিয়ারগান জোগাড় করাও কঠিন না। হোয়াইট সোয়ানেই আছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'আমিও দেখেছি,' অনিক বলল। 'বর্শার মাথা দিয়ে নখ সাফ করছিল রিগ মরগান।'

মাইলখানেক এগোনোর পর জীপের গতি কমাল আবীর। সামনে সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে গেছে রাস্তাটা। এই সময় পিছনে ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল।

ক্রমেই জোরাল হচ্ছে শব্দটা। বাঁক ঘুরে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল বাদামী রঙের একটা জীপকে। কাঁচা রাস্তায় ঝাঁকি খেতে খেতে তীব্র গতিতে ছুটে আসছে। পিছনে রেখে আসছে ধুলোর চওড়া মেঘ। দুজন লোক আছে জীপে। কিন্তু গাড়ির ছাতের ঢাকনাটা তুলে দেয়ায় আলো পড়ছে না ভিতরে, কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে ওদের চেহারা চেনা যাচ্ছে না।

রাস্তাটা খুবই সরু। তারপরেও গতি কমাল না বাদামী জীপটা। পাশ কাটানোরও কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

'সাবধান!' চেঁচিয়ে উঠল অনিক।

রিয়ারভিউ মিররে জীপটাকে দেখতে পাচ্ছে আবীর। আচমকা

যেন লাফ দিয়ে পিছন থেকে একেবারে পাশে চলে এল। গর্জন করছে ইঞ্জিন।

ধাক্কা থেকে বাঁচানোর জন্য সাঁই করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ডানে কাটল আবীর। খেপা ঘোড়ার মত ঝাঁকি খেয়ে লাফিয়ে উঠল ওদের জীপ।

'সাবধান!' আবার চেঁচিয়ে উঠল অনিক। 'বাঁয়ে কাট্!'

ডানে গভীর খাদ। জীপের সামনের বাঁ চাকাটা প্রায় পড়ে যাচ্ছে ওর মধ্যে। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে শেষ মুহূর্তে চাকাটা রাস্তার ওপর তুলে আনল আবীর।

কর্কশ হাসির শব্দ কানে এল পিছনের জীপ থেকে। পাশের জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল দুটো মাথা। অনিকদের কী হয়েছে দেখার জন্য। ওদের চেহারা দেখার প্রয়োজন নেই আবীরের। হাসিটাই চেনার জন্য যথেষ্ট।

'কে, বুঝতে পেরেছিস?' আবীরকে জিজ্ঞেস করল অনিক।

'নীল আর কোয়ান,' কঠিন স্বরে জবাব দিল আবীর।

সামনে বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল বাদামী জীপ। কর্কশ হাসিটা মিলিয়ে গেল দূরে।

'আমাদের বোটটা যেমন ধ্বংস করে দিয়েছিল, জীপটাও ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল,' রাগে ফুঁসে উঠল অনিক। চোখে এসে লাগছে ধুলো। হাত নেড়ে সরানোর চেষ্টা করল।

'সেই সাথে আমাদেরও খতম করতে চেয়েছিল,' আবীর বলল। 'ওরাই স্পিয়ার ছুঁড়েছে আমাদের দিকে, নাকি? কি মনে হয় তোর?'

'আমার মনে হয় না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল অনিক। 'যে স্পিয়ার ছুঁড়েছে, সে দেখা দিতে চায়নি। নীল আর কোয়ানের চরিত্র আলাদা। শয়তানি করে মজা পায় এই দুই ডাকাত, আর সেটা

সামনে এসে দেখাতে ভালও লাগে ওদের। আমার মনে হয়, কাকতালীয়ভাবে ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে আমাদের। দুর্ভাগ্য আরকি!'

'কিংবা এমনও হতে পারে, আমাদের দেখেইনি ওরা,' আবীর বলল। 'শয়তানি করে আমাদের জীপটাকে ফেলে দিতে চেয়েছিল। জানত না, ভিতরে আমরা আছি। কে ছিল না ছিল, তা নিয়ে ওদের মাথাব্যথা ছিল না। শেষে আমাদের দেখে মজাটা বেশি পেয়েছে।'

'বদ্ধ উন্মাদ, জনসন ঠিকই বলেছেন,' অনিক বলল। 'আসলেই ওরা উন্মাদ।'

ধীরে ধীরে দিন গড়িয়ে বিকেল হলো। অবশেষে একটা সাইন পেরোল গোয়েন্দারা। ইংরেজিতে যে কথাটা লেখা রয়েছে, তার মানে করলে দাঁড়ায়: লা সোফ্রিয়ার, আগ্নেয়গিরির ভিতর দিয়ে যাওয়া পৃথিবীর একমাত্র রাস্তা। কাঁচা, ধুলোয় ভরা একটা পার্কে আরও অনেক গাড়ির সঙ্গে নিজেদের জীপটাও পার্ক করল আবীর। একজন স্থানীয় লোক ওদের জানাল, আগ্নেয়গিরির ভিতর ঢুকতে হলে গাইড ছাড়া হবে না। এক কিনারে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন গাইডকে দেখাল সে।

'আরে, আন্টি গোয়েনি,' গাইডদের মধ্যে বৃদ্ধা মহিলাকে দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠল অনিক।

'হাই,' মহিলার দিকে এগোতে এগোতে হাত তুলে ডাকল আবীর। আন্টি গোয়েনির কাছে পৌঁছে বলল, 'কী, চিনতে পারছেন?'

'অবশ্যই পারছি,' মাথার ব্যানডানা হ্যাটটা টেনে ঠিক করে বসালেন আন্টি। 'মনিকার গল্প বলেছিলাম তোমাদের। আগ্নেয়গিরি দেখতে এলে নাকি? গল্প শোনানো ছাড়াও আরেকটা পেশা আছে আমার। গাইড।'

'আপনি গাইড হওয়াতে ভীষণ খুশি লাগছে আমার।' টাকা বের করার জন্য পকেটে হাত ঢোকাল অনিক।

গাইডের ফি পকেটে ভরে ছেলেদের নিয়ে ছোট একটা পাহাড়ের দিকে এগোলেন আন্টি। পাহাড় পেরিয়ে নেমে এলেন অন্যপাশে। অনিকের মনে হতে লাগল, এটা পৃথিবী নয়, ভিন্ন কোনো গ্রহে চলে এসেছে। চারপাশে কালচে-ধূসর পাথরের পাহাড় কোথাও উঠেছে, কোথাও নেমে গেছে। নিয়মিত কোনো ছন্দ নেই। সব কেমন এলোমেলো। বহু জায়গায় পাথরের ফাটল দিয়ে বাষ্প উঠছে। বাতাসে সালফারের পচা ডিমের মত গন্ধ।

'আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের ভিতর দাঁড়িয়ে আছো এখন তোমরা,' বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকা দুই গোয়েন্দাকে আরও বিস্মিত করে দিলেন আন্টি। 'এটা আর এখন অগ্ন্যুদ্গীরণ করে না, তবে ভিতরে এখনও ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। আমার কাছাকাছি থেকো। নিজে থেকে কিছু করতে যেয়ো না। গরম জায়গায় পা দিয়ে ফেলে পা পোড়াবে।'

আরও কয়েকজন টুরিস্টকে দেখতে পেল ওরা, গাইডদের সঙ্গে আগ্নেয়গিরি দেখছে। শূন্য ওপরিভাগটা ধরে একটা গাড়িকে এগিয়ে আসতে দেখল।

পাথুরে পাহাড়ের ধার ঘেঁষে ছেলেদের নিয়ে কিছুদূর এগোলেন আন্টি। তারপর দাঁড়িয়ে গেলেন। পায়ের কাছেই দেখতে পেল অনিক, কালো রঙের ঘন তরল পদার্থ থেকে আগ্নেয়গিরির আগুনের তাপে বুদবুদ উঠছে। 'কী সাংঘাতিক!' বিস্মিত না হয়ে পারল না সে।

খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর অবশেষে অনিক বলল, 'আসল কথায় আসা যাক এবার। আন্টি, আপনার কাছে একটা কথা জানতে এলাম। আপনি বলেছেন, দ্বীপের সব কথা আপনার জানা। স্কেলিটন

রীফের ব্যাপারে কতখানি জানেন?'

'সব জানি। তোমরা কী জানতে চাও?'

'জানতে চাই, রীফের উত্তর ধারে কোন জাহাজ কিংবা বোট ডুবেছে কিনা। সাধারণ জলযান নয়। এমন যান, যেটাতে মূল্যবান মালামাল ছিল।'

কথাটা গম্ভীর করে দিল আন্টিকে। কেমন বিষণ্ণও। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ধরে তাঁর কথা বলার অপেক্ষায় থাকল অনিক-আবীর, কানে আসতে থাকল শুধু ঘন তরলের মধ্যে বুদবুদের ভুটুর-ভুটুর আর ফুটফাট শব্দ।

অবশেষে কথা বললেন আন্টি, 'হ্যাঁ, রীফের ওই দিকটাতে খারাপ কিছু আছে। খুবই খারাপ।'

'যেমন?' জানতে চাইল আবীর।

'সরি!' মাথা নাড়লেন আন্টি। 'সেকথা আমি তোমাদের বলতে পারব না।'

'আন্টি গোয়েনি,' অনিক বলল, 'কেন জানি না, কিন্তু আমার মন বলছে ওই খারাপ জিনিসটার কথা আমাদের জানা দরকার। একজন মানুষের জীবন নির্ভর করছে আমাদের এই জানা না জানার ওপর। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন।'

অনিকের দিকে তাকিয়ে রইলেন আন্টি। আবীরের দিকে ফিরলেন। আবার তাকালেন অনিকের দিকে। 'মনে হচ্ছে তোমাদের বিশ্বাস করা যায়। তোমরা সৎ। ভাল ছেলে। এটুকু অন্তত বোঝা হয়ে গেছে।'

'ঠিক,' হেসে জবাব দিল আবীর। 'আমরা সৎ। এবং ভাল।'

'না, ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি আমি।' হাঁটতে শুরু করলেন আবার আন্টি। পাহাড়ী রাস্তা ধরে পাহাড়ের দেয়ালের ধার ঘেঁষে। পিছে

পিছে এগোল অনিক-আবীর। আন্টি জিজ্ঞেস করলেন, 'প্লুটোনিয়াম কি জিনিস, জানো তোমরা?'

'জানি,' জবাব দিল অনিক। 'এক ধরনের তেজস্ক্রিয় পদার্থ, খুবই দুর্লভ। আণবিক বোমা বানাতে প্রধান যে দুটো জিনিস প্রয়োজন হয়, তার একটা।'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকালেন আন্টি। 'এখন শোনো। উনিশশো ষাট সালের গোড়ার দিকে রাশান সরকার কিছু প্লুটোনিয়াম পাঠিয়েছিল কিউবায়। পরিমাণে খুব বেশি না, তবে দুটো আণবিক বোমা বানানোর জন্য যথেষ্ট।'

'কিউবা কি বোমা দুটো বানিয়েছিল?' আরেকটা কালো তরলের বুদবুদ ওঠা ডোবার পাশ কাটানোর সময় প্রশ্ন করল আবীর।

'না,' পাহাড়ী পথ ধরে ওপরের দিকে উঠা শুরু করেছেন আন্টি। 'প্লুটোনিয়াম নিয়ে কিউবায় পৌঁছল রাশান জাহাজ। জাহাজের একজন অফিসার কিউবান অফিসারের হাতে তুলে দিল প্লুটোনিয়ামের বাক্স। কিন্তু তাতে তখন আসল জিনিস ছিল না। অন্য আরেকজন বাক্স থেকে আসল মাল সরিয়ে তার জায়গায় গম ভর্তি করে দিয়েছিল। আর একটা গমের বাক্সে সরিয়ে ফেলেছিল প্লুটোনিয়াম। একই জাহাজে করে সেসময় প্রচুর বাক্সভর্তি গম গিয়েছিল কিউবায়। মানেটা বুঝতে পারছ? কিউবা যাতে প্লুটোনিয়াম না পায়, সেই প্ল্যান করা হয়েছিল।'

'সেই গমের বাক্সটার কী হলো?' মুখে এসে লাগছে সালফারের বাষ্প। বড় অস্বস্তিকর। হাত নেড়ে মুখের সামনে থেকে সরানোর চেষ্টা করল আবীর।

'একজন কিউবান শ্রমিক, যে জাহাজ থেকে মাল নামাচ্ছিল,' আন্টি বললেন, 'বাক্সটা নিয়ে গিয়ে তার ট্রাকে তুলল। চালিয়ে নিয়ে

চলে গেল দ্বীপের অন্যপ্রান্তে। একজন জেলের হাতে তুলে দিল বাক্সটা। জেলে বাক্সটা নিয়ে গিয়ে তুলল একটা মাছধরা নৌকায়। নৌকাটার নাম "এল গ্যাটো"। এল গ্যাটো শব্দটা স্প্যানিশ শব্দ। গ্যাটো মানে বিড়াল।'

'কিন্তু কিউবা থেকে প্লুটোনিয়াম চুরি করল কেন লোকগুলো?' অনিক জানতে চাইল। এসময় একজন গাইডের সঙ্গে কয়েকজন টুরিস্ট ওদের পাশ কাটাল।

'এটা আমি শিওর হয়ে বলতে পারব না,' আন্টি বললেন। 'কেউ বলে প্রচুর টাকার বিনিময়ে কারও কাছে বিক্রি করে দেয়ার জন্য ওই প্লুটোনিয়াম চুরি করা হয়েছিল। আবার কেউ বলে আমেরিকার সিআইএ-র কাজ। ওরা চায়নি, কিউবা অ্যাটম বোমা বানাক।'

'আচ্ছা, যাই হোক। ওই প্লুটোনিয়ামের বাক্স এল গ্যাটোতে তুলে তারপর কী করল?' জিজ্ঞেস করল অনিক।

জবাব দেওয়ার আগে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন আন্টি। ভাবছেন, না বিশ্রাম নিচ্ছেন, বোঝা গেল না। সালফারের বাষ্প এখন অনেক ঘন হয়েছে। গন্ধটাও কড়া। কাছেই একটা ডোবা থেকে বুদবুদ উঠতে দেখল অনিক। এটার তরল পদার্থ কালো নয়, বরং হলুদ। বুদবুদগুলোও অনেক বড় আর ফাটছেও জোরাল শব্দ তুলে।

'প্লুটোনিয়ামের বাক্স নিয়ে ব্রাজিলের দিকে যাচ্ছিল এল গ্যাটো,' আন্টি বললেন। 'কিন্তু ক্যারিবিয়ান সাগরে পৌঁছে প্রবল ঝড়ের কবলে পড়ল বোট। তারপর যা ঘটার তাই ঘটল। আরও অনেক জাহাজ আর বোটের মতই এই বোটটাও ডুবে গেল। রীফের ঠিক উত্তর প্রান্তে। প্লুটোনিয়াম সহ মাল্লারা সবাই ডুবে গেল সাগরে, মাত্র একজন বাদে।'

'একজন বেঁচেছিল?' আবীরের প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। সাঁতরে এসে সেইন্ট লুসিয়ার তীরে উঠেছিল সে।'

'তারমানে,' অনিক বলল, 'ওই প্লুটোনিয়াম এখনও রীফের কাছে পানির নিচেই পড়ে আছে?'

'আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' আন্টি জবাব দিলেন।

'শুনে কেমন যেন লাগছে,' আবীর বলল। 'গল্পটা সত্যি তো?'

'কী বলছ তুমি! সত্যি মানে?' আহত মনে হলো আন্টিকে। 'আমার সব গল্প সত্যি। বানানো গল্প আমি বলি না।'

'আমিও তাই মনে করি,' হেসে বলল অনিক। 'কিন্তু তারপরেও আবার জিজ্ঞেস করি, এঘটনা কি সত্যিই ঘটেছিল?'

'হ্যাঁ, ঘটেছিল,' ভারি কণ্ঠে জবাব দিলেন আন্টি।

'আপনি জানলেন কী করে?'

'কারণ,' হাত উল্টালেন আন্টি, 'সাঁতরে তীরে উঠতে পেরেছিল যে লোকটা, সে ছিল আমার মায়ের খালাত বোনের বান্ধবীর বেয়াইনের স্বামী।'

'ও, তাই তো! খুব কাছের সম্পর্ক!' না বলে পারল না অনিক।

'হ্যাঁ, এনিয়ে আর কোনো তর্ক করা সাজে না আমাদের, তাই না?' আবীর বলল।

আন্টিকে অনুসরণ করে পাহাড়ের ওপর দিকে উঠে চলল দুজনে। আন্টি বললেন, 'আমি জানি, গল্পটা সত্যি।' ওপরে ওঠার পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছেন। 'কিন্তু কথাটা আমি আর কাউকে বলিনি। বললে মৌচাকে ঢিল পড়ত। সবাই গিয়ে ওই প্লুটোনিয়াম খোঁজা শুরু করে দিত। দামী জিনিস। কিন্তু মানুষের প্রাণের চেয়ে দামী নয়। আমি চাই না ওই প্লুটোনিয়াম দিয়ে বোমা বানিয়ে মানুষ মানুষকে খুন করুক।'

'ওই প্লুটোনিয়ামের খবর আপনি ছাড়া আর কেউ জানে না?' আবীর জিজ্ঞেস করল।

'জানে, দ্বীপের কয়েকজন,' আন্টি জবাব দিলেন। 'তারাও কথাটা গোপন রেখেছে। তবে কয়েক দিন আগে আমি একজনকে বলে ফেলেছি।'

'কাকে?' ঘাড় থেকে ঘাম মুছল আবীর।

দাঁড়িয়ে গেলেন আন্টি। অনিক-আবীরও থামল। অনেক ওপরে উঠেছে। পুরো জ্বালামুখটা চোখে পড়ছে এখান থেকে। চারদিকে পাহাড়ের গায়ের অসংখ্য ফাটল দিয়ে বাষ্পের মত ধোঁয়া বেরোচ্ছে। হলিউডের হরর ছবির মত দৃশ্য।

'আমি বলেছি, মারমেড প্রিন্সেসের গুপ্তধন উদ্ধার করছে যে লোকটা, তাকে,' আন্টি জানালেন। 'ইমবেলিক জনসন।'

'তাঁকে বলতে গেলেন কেন?' অনিকের প্রশ্ন।

'কারণ, সাগর থেকে জিনিস তোলার ওস্তাদ ওই লোক। তাঁর সঙ্গে কথা বলে তাঁকে আমার বিশ্বাসযোগ্যও মনে হয়েছে। আমি তাঁকে বলেছি, যাতে প্লুটোনিয়ামগুলো তুলে এনে আমার হাতে দেয়। আমি নিয়ে গিয়ে এমন জায়গায় পুঁতে রাখব, জীবনে আর কেউ খুঁজে পাবে না। আমি মারা গেলে কেউ কোনোদিন জানবে না ওগুলো কোথায় আছে। খুব, খুব, খুউব খারাপ জিনিস ওগুলো।'

হঠাৎ করে তীব্র হিসহিস শব্দ শুরু হলো। ঘুরে তাকাল অনিক। আগ্নেয়গিরির একটা উষ্ণপ্রস্রবণ থেকে ভয়ঙ্কর গতিতে ফোয়ারার মত ছিটকে উঠছে হলুদ রঙের তরল পদার্থ।

'সরো! সরে যাও!' চেঁচিয়ে উঠলেন আন্টি। 'ফুটন্ত পানির চেয়েও গরম ওগুলো।'

তাড়াতাড়ি কয়েক পা পিছিয়ে গেল আবীর। জিজ্ঞেস করল, 'জনসন কী আপনার জিনিস তুলে দিতে রাজি হয়েছেন?'

'সে বলেছে, এখন অতিরিক্ত ব্যস্ত,' প্রস্রবণের হিসহিসে গর্জনকে ছাপিয়ে চেঁচিয়ে জবাব দিলেন আন্টি। 'তবে অবসর সময়ে চেষ্টা করা যায় কিনা ভেবে দেখবে।'

'তাই,' প্রস্রবণটার দিকে তাকিয়ে আছে অনিক। 'হঠাৎ করে যেরকম শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেছে আবার। 'আন্টি, সত্যি, অনেক সাহায্য করলেন। গল্পের জন্য কত চান?'

'না, কিছু চাই না। এই গল্পটা বিনা পয়সায় শোনালাম।' হাসলেন আন্টি। 'তোমাদেরকে আমার ভাল লেগেছে।'

আগ্নেয়গিরি দেখা হয়েছে। যা জানতে চেয়েছিল, জানা হয়েছে। আর কিছু করার নেই এখানে। আন্টির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জীপে ফিরে এল ছেলেরা। বাংলোয় ফিরে চলল।

গাড়ি চালাতে চালাতে আবীর বলল, 'অনিক, তোর কি মনে হয় রাতের বেলা জনসনই হোয়াইট সোয়ানকে নিয়ে ওই প্লুটোনিয়াম খুঁজতে যান?'

'না,' অনিক বলল। 'কাল রাতে জাহাজে ছিলেনই না তিনি। তা ছাড়া মারমেড প্রিন্সেসের কাছ থেকে জাহাজ সরানোর ঝুঁকি তিনি নেবেন না। এমন হতে পারে, আন্টির কাছ থেকে শুনে গিয়ে তাঁর কোনো কর্মচারীকে প্লুটোনিয়ামের কথা বলেছিলেন তিনি। জনসনের সেই কর্মচারীই তাঁকে না জানিয়ে এখন রাতের বেলা গোপনে প্লুটোনিয়াম খুঁজে বেড়ায়।'

'একা পারবে না সেই কর্মচারী। নুশান আর অ্যান্থনির সাহায্য নিতেই হবে তাকে।' গীয়ার বদলাল আবীর। ঢাল বেয়ে উঠছে। 'কাল রাতে পানিতে ডুব দিয়েছিল যে লোকটা, যার আলো দেখেছি পানিতে, সেই লোকই হয়তো জনসনের কর্মচারী।'

'মনে হয়। প্লুটোনিয়াম তুলে এনে অনেক দামে বেচতে পারবে।

সেই লোভে পেয়েছে ওদের,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল অনিক। একটা আঙুরের ওজনের প্লুটোনিয়াম দিয়ে বানানো বোমারও এত ক্ষমতা, একটা গোটা শহর ধ্বংস করে দিতে পারে। আন্টি গোয়েনি যে বলেছেন, খারাপ, খুব খারাপ, মিথ্যে বলেননি। বরং কমই বলেছেন। জিনিসটা শুধু খারাপ না, ভয়ঙ্কর। যতখানি প্লুটোনিয়াম আছে ওখানে, এর অর্ধেকটাও যদি পেয়ে যায় লোকগুলো, তিরিশ-চল্লিশ লাখ ডলারে বেচতে পারবে।'

'সরকারি অনুমতি না নিয়ে রীফের ওখানে হারানো জিনিস খোঁজা বেআইনী,' আবীর বলল। 'আর প্লুটোনিয়াম তুলে বিক্রি করা তো আরও বেআইনী। কারিনা যদি সত্যিই সেটা জেনে গিয়ে থাকে, শুনে থাকে, কিংবা দেখে থাকে, তাহলে প্লুটোনিয়াম যারা খুঁজছে তারা যে তাকে খুন করতে চাইবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। খুন করার পক্ষে জোরাল মোটিভ আছে শত্রুদের।'

'কিন্তু কথা হলো, কারিনা সত্যি জানে তো?'

'নইলে তাকে খুন করতে চাইবে কেন শত্রুরা?'

বাংলোর পাশে এসে যখন জীপ থামাল আবীর, গোধূলির ছায়া নামছে। খালি বাড়ি। হিপো নেই। হিপোকে সৈকতে পাওয়া যেতে পারে ভেবে সেদিকে রওনা হলো দুজনে।

গোলাপি আর কমলা রঙে মিশানো তখন পশ্চিমের আকাশ। সাগরের পানি ছুঁয়েছে সূর্য।

বালির কিনারে পৌঁছে একজন তরুণীকে চোখে পড়ল ওদের। অল্প পানিতে দাঁড়ানো। সাদা রঙের ঢোলা পোশাক পরনে। বাতাসে উড়ছে পোশাকের কানা। ডাঙার দিকে পিছন করে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে সে। কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না অনিক। কিন্তু দিনশেষের এই ভূতুড়ে আলোয় মেয়েটাকে ভূত

ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারল না সে। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কে ও?'

'মনিকার মতই তো লাগছে!' আবীরের জবাব।

চোদ্দ

'দাঁড়া! দাঁড়া!' দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা বলে উঠল অনিক, 'ও মনিকা না, কারিনা!'

'ঠিক!' আনন্দে চিৎকার করে উঠল আবীর। মনে পড়ল হাসপাতালের বিছানায় বালিশে ছড়িয়ে থাকা কারিনার চুলের কথা। এখন যে রকম খুশি হলো, কাউকে দেখে জীবনে এত খুশি কমই হয়েছে সে।

'ওই নারকেল গাছটার নিচে দেখ,' হাত তুলে দেখাল অনিক। 'হিপো। চল, কথা বলি।'

দ্রুত হেঁটে হিপোর কাছে চলে এল দুজনে। বালিতে বসে স্থির দৃষ্টিতে কারিনার দিকে তাকিয়ে আছে হিপো। আবীর বলল, 'কোথায় পেলি ওকে?'

'এখানেই,' উঠে দাঁড়াল হিপো। 'তবে আমি পেয়েছি বলাটা ঠিক হবে না। এখানে এসে দেখা পেলাম। তোদের মতই। সারাটা দিন গ্রামে গ্রামে খুঁজে বেরিয়েছি। কতজনকে যে জিজ্ঞেস করেছি ঠিক-ঠিকানা নেই। কেউই খোঁজ দিতে পারেনি। আধঘণ্টা আগে এখানে এসেছি। বিশ্রাম নিতে বসেছিলাম। চোখ বুজে এসেছিল। চোখ মেলতেই দেখি পানির কিনারে হেঁটে বেড়াচ্ছে ও। কাছে গিয়ে

জানালাম, কীভাবে হন্নে হয়ে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি আমরা। ওকে সাহায্য করতে চাই, সেকথাও বলেছি।'

'কোথায় ছিল, জিজ্ঞেস করেছিস?' জানতে চাইল অনিক।

'করেছি। হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়ে প্লেনে করে গ্রেনাডা নামে এখানকারই একটা দ্বীপে চলে গিয়েছিল। গতকাল ওখানেই ছিল। আজ এসেছে।'

'কি হয়েছিল ওর, বলেছে কিছু?' আড়চোখে কারিনার দিকে তাকাল একবার আবীর। 'কে ওকে খুন করতে চেয়েছিল, জানাটা এখন অতি জরুরী হয়ে উঠেছে। বলা যায় না, খুনের তালিকায় এরপর হয়তো আমাদের নাম আছে।'

'না,' মাথা নাড়ল হিপো। 'কিছুই জানাতে পারেনি কারিনা। কোনো কথাই মনে করতে পারছে না ও। সেকারণেই সেইন্ট লুসিয়ায় আবার ফিরে এসেছে। তার ধারণা, ঘটনাটা যেহেতু এখানে ঘটেছে, এখানেই সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। স্মৃতি ফেরানোর জন্য ওখানে পানির মধ্যে এভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছে। বিষ্যুৎবার রাতে কী ঘটেছিল মনে করার চেষ্টা করছে।'

সারাদিনে যা যা ঘটেছে, সব হিপোকে খুলে বলল অনিক-আবীর। তারপর কারিনার দিকে এগোল। ঢেউ যেখানটায় ক্রমাগত বালির ওপর এসে আছড়ে পড়ছে, সেখানে এসে দাঁড়াল। ওদের সাড়া পেয়ে ফিরে তাকাল কারিনা। বাতাসে উড়ছে লম্বা চুল।

'হ্যাল্লো!' অনিক বলল। 'দেখা হয়ে গেল আবার। খুব ভাল লাগছে।'

'আমারও,' খানিকটা আড়ষ্ট ভঙ্গিতে জবাব দিল কারিনা। উদ্বিগ্ন লাগছে ওকে।

'কী, মনে পড়েছে কিছু? স্মৃতি ফিরেছে?' আবীর জিজ্ঞেস করল।

'নাহ্,' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল কারিনা। 'আমি শিওর, বিষ্যুৎবার রাতে কেউ আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেরাতের কথা তো বটেই, এমনকী তার আগের কয়েক রাতের কথাও পুরোপুরি মুছে গেছে আমার স্মৃতি থেকে। পুরো শূন্য।'

'তারমানে বোঝা যাচ্ছে আগের রাতগুলোও ওই রাতটার সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত,' অনিক বলল। 'নিশ্চয় এতই ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছিল, আগের কথাও মুছিয়ে দিয়েছে। হয় এরকম।'

'এখানে, সৈকতে এসে কি কোনো সুবিধে হচ্ছে?' আবীর জানতে চাইল।

'অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে,' কারিনা জানাল। 'মনে হচ্ছে, স্মৃতিগুলো যেন খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। কিন্তু অতটা কাছে আসছে না, যাতে সব কথা আমার মনে পড়ে যায়।'

'আসুন আমার সঙ্গে।' কতগুলো নারকেল গাছের জটলার মধ্যে কারিনাকে নিয়ে এল অনিক। ওদের সঙ্গে এল আবীর ও হিপো। বালিতে বসল সবাই। চমৎকার ফুরফুরে বাতাসে মাথার ওপর নারকেলের ডাল দুলছে। দিগন্তে যেন পানির নিচে ডুব দিয়েছে সূর্যটা। গোধূলির সবুজ আলো চারিদিকে। সাগরের পানির রঙ বদলে গেছে। অদ্ভুত বেগুনি আর ফিকে নীলের মিশ্রণ।

'কারিনা,' স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটার চোখে চোখে তাকিয়ে থেকে অনিক বলল, 'আপনার স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করছি আমি। শান্ত হয়ে, স্নায়ুগুলো সব ঢিল করে দিয়ে বসুন। সমস্ত চিন্তা দূর করে দিন মন থেকে। আমি যা বলি শুনুন। বিষ্যুৎবার রাতে আপনি ম্যাসন মোঁপার বাড়িতে তাঁর হিসেবের কাজ করেছেন। মনে পড়ছে?'

'না,' চুপচাপ অনিকের দিকে তাকিয়ে আছে কারিনা। 'তবে এর আগে বেশ কয়েকবার তাঁর জমা-খরচের হিসেব করে দিয়েছি। মনে

আছে। কিন্তু বিষ্যুৎবারের কথা মনে নেই।'

'ঠিক আছে, না থাকলে নেই,' কোমল কণ্ঠে বলল অনিক। 'আমি জেনেছি, আপনি ওখানে ছিলেন। তারপর, আমার ধারণা, ম্যাসনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপনি সাগরের কিনারে চলে এসেছিলেন। কোনো ধরনের জলযানে চড়েছিলেন। কি, মনে পড়ছে কিছু?'

'উঁ...উঁহু!' মাথা নাড়ল কারিনা।

'কিছুই মনে পড়ছে না? একআধটা কথাও না?'

'ইয়ে...হয়তো...' আঙুল চালিয়ে পিছনে চুল সরাল কারিনা।

'বোটে করে খোলা সাগরে চলে গিয়েছিলেন আপনি,' অনিক বলল। 'এখন আর মনে পড়ছে না আপনার। কারিনা, তবু আপনাকে চেষ্টা করতে বলছি। চোখ বুজুন। স্নায়ু ঢিল করুন। উত্তেজনা কমান।'

চোখ বুজল কারিনা। দুই হাত রাখল কোলের ওপর।

'এখন ঢেউয়ের শব্দ শুনুন,' মানসিক রোগের ডাক্তারের মত কথা বলছে অনিক। 'কল্পনা করার চেষ্টা করুন, ওই বোটে রয়েছেন আপনি। অন্ধকার সাগরে ছুটে চলেছে বোট। আকাশে কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ। আজকে তো চাঁদটা বড় হয়েছে, সেদিন এরচেয়ে অনেক সরু ছিল। বোট কিছুদূর যাওয়ার পর, আমার বিশ্বাস, হোয়াইট সোয়ানকে চোখে পড়েছিল আপনার। আপনার বোট এগিয়ে চলেছে জাহাজের দিকে। কাছে চলে আসছে জাহাজটা...কাছে...আরও কাছে...।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাতে লাগল কারিনা, যেন গল্পের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছে তার কল্পনা।

আশা জাগল অনিকের। 'ফিরেছে? স্মৃতি ফিরেছে? মনে পড়ছে আপনার?'

'নাহ্!' অনিশ্চিত স্বরে জবাব দিল কারিনা। 'পারছি না...আমি পারছি না...আমি আসলে কিছুই মনে করতে পারছি না!'

'শান্ত হোন। উত্তেজনা কমান। পারতে আরম্ভ করেছেন আপনি।'

অনিকের মত ধৈর্য রাখতে পারল না আবীর। আচমকা জিজ্ঞেস করে বসল, 'কারিনা, প্লুটোনিয়াম শব্দটা কি আপনার পরিচিত?'

'প্লুটোনিয়াম?' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল কারিনা। চোখ এখনও বন্ধ। কেঁপে উঠল থরথর করে। 'শব্দটা শুনে ভয় লাগছে আমার। কেন, বলতে পারব না।'

'স্কেলিটন রীফে প্লুটোনিয়াম আছে, এটা তো মনে করতে পারছেন?' প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল হিপো।

'অ্যাঁ!' দুই ভুরু কুঁচকে কাছাকাছি হয়ে গেল কারিনার।

'প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে একটা কিউবান মাছধরা নৌকা ডুবে গিয়েছিল স্কেলিটন রীফের উত্তর প্রান্তের কাছে।' অনিকের মনে হচ্ছে স্মৃতি ফিরে পাবার সন্ধিক্ষণে চলে এসেছে কারিনা। 'আমার ধারণা, প্লুটোনিয়াম সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি। আর একারণেই কেউ আপনাকে খুন করতে চেয়েছিল।'

চোখ তো মেললই না, চোখের পাতা আরও শক্ত হয়ে চেপে বসল কারিনার।

'কারিনা, কিউবান মাছধরা বোটে করে কারা প্লুটোনিয়াম বহন করেছিল, মনে করতে পারেন?'

'আহ্!' এমন ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠে বালিতে চাপড় মারল কারিনা, যেন ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। 'খুব পরিচিত লাগছে শব্দটা...মনে আসি আসি করেও আসতে চাইছে না...। ইস্, কী ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে আমার! ভীষণ হতাশা!'

'অত হতাশার কিছু নেই,' অনিক বলল। 'ভাবতে থাকুন। চলে

আসবে মনে।'

'কিন্তু আমি সত্যিই জানতে চাই, আসলে কী হয়েছিল আমার,' চোখ মেলল কারিনা। 'আমি জানি, বিষ্যুৎবার রাতে কেউ একজন আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। আমি জানতে চাই, কে সেই লোক। তাহলে সাবধান থাকতে পারব। হয়তো আরেকবার আমাকে খুন করার চেষ্টা থেকে বিরত রাখতে পারব তাকে। নইলে সারাটা জীবন অজানা আতঙ্কে পালিয়ে বেড়াতে হবে আমাকে। সব সময় মনে হবে, এই বুঝি আমার পিছে লাগল কেউ...সব সময় পিছন দিকে নজর রাখতে হবে আমার। বার বার ফিরে তাকাতে তাকাতে পাগল হয়ে যাব।'

'শান্ত হোন,' আবীর বলল। 'অত ভয় পাবেন না। আমরা আপনাকে পাগল হতে দেব না। এরহস্যের সমাধান আমরা করবই।'

'হ্যাঁ,' আবীরও সুর মেলাল তার সঙ্গে। 'আপনার সঙ্গে কথা বলে যা বুঝতে পারলাম, প্লুটোনিয়াম শব্দটা টোকা দিয়েছে আপনার স্মৃতিতে। এখন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, রাতের বেলা হোয়াইট সোয়ানকে কেন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল স্কেলিটন রীফের উত্তর প্রান্তে। কেন আপনাকে খুন করতে চেয়েছিল। আসল খবরটা জেনে গিয়েছিলেন আপনি। ওরা জাহাজ থেকে আপনাকে পানিতে ফেলে দিয়েছিল ডুবে মরার জন্য। বার বার আপনি "স্কেহ" শব্দটা উচ্চারণ করছিলেন। তারমানে স্কেলিটন রীফের কথা বলতে চাইছিলেন।'

'কিন্তু সমস্যাটা হলো,' হিপো বলল, 'ওরা যে কারিনাকে খুন করতে চেয়েছিল, কোনোদিন প্রমাণ করতে পারব না আমরা। কারণ, সে মনেই করতে পারছে না কিছু। আসল অপরাধীকে যদি খুঁজে বের করিও আমরা, তাকে চাপ দিতে পারব না, স্রেফ অস্বীকার করবে।

কারিনা কিছু মনে করতে না পারলে কোনোমতেই ফাঁসাতে পারব না অপরাধীকে।'

'তারমানে,' বালিতে দুই পা টানটান করে দিল অনিক, 'স্কেলিটন রীফের সবচেয়ে বড় রহস্যটা লুকিয়ে রয়েছে এখন কারিনা অ্যান্ডারসনের মনের ভিতর।'

'কী করব বলো,' কেঁদে ফেলার জোগাড় কারিনার। 'সত্যি বলছি, মনে করতে পারছি না। পারলে তো বলতামই।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বলল হিপো, 'ও নিয়ে ভাববেন না। ওই রহস্য আমরা ভেদ করে ফেলবই।'

নানাভাবে বোঝাতে লাগল অনিক-আবীর। হাসি ফুটল কারিনার মুখে। এই প্রথম তাকে হাসতে দেখল আবীর। ভাল লাগল তার।

'জানেন,' চিন্তিত ভঙ্গিতে কারিনার দিকে তাকিয়ে বলল অনিক, 'ডাক্তার যখন কোনো রোগীকে কোনো ঘটনা মনে করানোর জন্য চেষ্টা করেন, তখন তাকে সম্মোহিত করে ঘটনাস্থলে নিয়ে যান। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমি হিপনোটিজম জানি না, সম্মোহিত করতে পারব না। তবে সম্মোহিত না করেও যদি আপনাকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া যায়, আমার বিশ্বাস সব কথা মনে পড়ে যাবে আপনার।'

'মনে হচ্ছে,' কারিনা জবাব দিল। 'এখানে এই সৈকতে তো এলামই সেকারণে। এখানে এসে ধারণাটা আরও জোরাল হয়েছে আমার।'

অনিকের দিকে তাকাল আবীর। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। 'চল না আজ রাতেই চলে যাই। যত দেরি করব, কারিনার বিপদ বাড়বে। আবার কোনো অঘটন ঘটে গেলে শেষে আফসোসের সীমা থাকবে না। আজও নিশ্চয় স্কেলিটন রীফের উত্তর প্রান্তে যাবে হোয়াইট সোয়ান।'

'এখান থেকেই একটা প্ল্যানট্যান করে গেলে হতো না?' হিপো বলল। 'ওখানে গিয়ে কী করব আমরা?'

'আমি একটা বুদ্ধি বের করেছি,' অনিক বলল, 'আশা করি পছন্দ হবে তোদের।'

'কী?' জানতে চাইল আবীর।

'ভাবছি,' থাবা দিয়ে হাঁটু থেকে বালি ঝাড়ল অনিক। 'বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে না তো?'

'হোক। তুমি বলো।' অনিকের হাত খামচে ধরল কারিনা। 'আমার কী ঘটেছিল, জানতেই হবে আমাকে।'

*

কাঠের একটা স্কিফ নৌকা ক্যারিবীয় সাগরের পানি কেটে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। নৌকার আরোহী চারজন। অনিক, আবীর, হিপো ও কারিনা। আকাশে বাঁকা চাঁদ। আলো নেই। শুধু আভাটুকু আছে। সাগর অন্ধকার।

আবীর আর হিপো, দুজনের পরনেই ডুবুরির পোশাক। অনিক পরেছে আগাগোড়া কালো পোশাক। মেকআপ করে মুখটাকে সাদা বানিয়ে ফেলেছে কারিনা। ফ্যাকাশে সাদা। অন্ধকারে ভূতুড়ে লাগে। বোট চালাচ্ছে সে। নির্দেশনা দিচ্ছে অনিক। বোটটা ধার নিয়েছে ওরা হিপোর চাচার এক বন্ধুর কাছ থেকে।

'হোয়াইট সোয়ানকে দেখতে পাচ্ছি,' দূরবীন দিয়ে দেখতে দেখতে বলল আবীর। 'নুশান আর অ্যান্থনি রয়েছে ডেকে। পিছনের গানলের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। আর কাউকে দেখছি না। পানিতে হালকা আলো দেখা যাচ্ছে।'

'তারমানে ডুব দিয়েছে কেউ,' হিপো বলল।

অনিকের নির্দেশে বোটের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল কারিনা। অনিক বলল, 'শো'টা শুরু করা যায় এবার। সবাই রেডি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কারিনা। কণ্ঠের অস্বস্তি চাপা দিতে পারল না।

'চল, নেমে পড়ি,' হিপো বলল। সে আর আবীর দুজনেই ডাইভিং ট্যাংকের ফিতে বাঁধল। মাউথপিস মুখে লাগাল। কব্জিতে বাঁধা ডাইভিঙ ওয়াচ চালু করল। তারপর আস্তে করে নেমে পড়ল পানিতে।

ইঞ্জিন বন্ধ। দাঁড় বেয়ে নৌকা নিয়ে জাহাজের দিকে এগোতে লাগল অনিক। বেশ দূরে আছে এখনও জাহাজটা। দূরবীন ছাড়া দেখা যায় না। নৌকার সামনের দিকে এগিয়ে এল কারিনা। অনিককে জিজ্ঞেস করল, 'ধোঁকা দিতে পারব তো?'

'পারবেন। চুলগুলো আরেকটু এলোমেলো করে দিন,' অনিক বলল। 'শুধু মাথায় রাখবেন, আপনি এখন কয়েকশো বছরের পুরানো একটা ভূত। এমন কোনো আচরণ করবেন না, যাতে ওরা বুঝে যায় আপনি মানুষ।'

কয়েক মিনিট পর জাহাজের কাছে পৌঁছে গেল নৌকাটা। শব্দ শুনে ডাক দিল অ্যান্থনি, 'আহয়! কে যায়? বিনা অনুমতিতে এখানে ঢোকা নিষেধ। সরকারের কাছ থেকে লিজ নিয়েছি আমরা।'

দাঁড় বাওয়া চালিয়ে গেল অনিক। নৌকার সামনের গলুইয়ের কাছে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে কারিনা। গানলের কাছ থেকে নুশানকে সরে যেতে দেখল অনিক। মনে হলো কোনো কিছু আনতে গেছে।

'আমি আবার বলছি,' হাঁক দিল অ্যান্থনি, 'এখানে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ। আর এগোবে না বলে দিলাম!'

কিন্তু থামল না অনিক। কোনো পরিবর্তনই নেই তার মাঝে।

বেয়েই চলেছে দাঁড়। দ্রুত সামনে ছুটে যাচ্ছে নৌকাটা।

'ঠিক আছে, ভালভাবে বললাম শুনলে না যখন, এটা দিয়ে শোনাব!' হুমকি দিল নুশান। তার হাতে একটা রাইফেল তুলে দিল অ্যান্থনি। আরেকটা নিজের হাতে। ওগুলো আনতেই গিয়েছিল। রাইফেল তুলে নিশানা করল দুজনেই।

তবু থামল না অনিক। দাঁড় বেয়েই চলেছে। মনে মনে ভয় পাচ্ছে, নুশানরা এখন গুলি করে বসলে সর্বনাশ। দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে কারিনা। পরনের সাদা ঢোলা পোশাকটা বাতাসে উড়ছে।

রাইফেল নামিয়ে নিল দুই ভাই। পানি থেকে দাঁড় তুলে নিল অনিক। এক জায়গায় ভাসতে থাকল নৌকাটা।

চিৎকার করে অ্যান্থনি ডাকল, 'মনিকা!'

নৌকার গলুইয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মনিকারূপী কারিনা। জবাবও দিল না। নড়লও না।

ওর দিকে তাকিয়ে আছে অ্যান্থনি ও নুশান। বোঝার চেষ্টা করছে সত্যি সত্যি মনিকার ভূত এসে হাজির হয়েছে, না অন্য কিছু। মনে মনে হাসল অনিক। কাজ হচ্ছে। ধোঁকা দিতে পেরেছে। তবে জানে, খুব বেশিক্ষণ ওই দুজনকে ধোঁকায় রাখতে পারবে না। আবীর আর হিপো এখন ওদের কাজটা ঠিকমত করতে পারলেই হয়।

আবীর আর হিপো ততক্ষণে উল্টো দিক দিয়ে নিঃশব্দে জাহাজে উঠে পড়েছে। প্রথমে পায়ের ফিন খুলল দুজনে। ভূত নিয়ে আলোচনা করছে নুশানরা দুই ভাই। পা টিপে টিপে ওদের পিছনে এসে দাঁড়াল গোয়েন্দারা।

আচমকা থাবা দিয়ে অ্যান্থনির হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিল

হিপো। চোখের পলকে নলটা ঠেসে ধরল অ্যান্থনির পিঠে। নড়তে নিষেধ করল। তারপর নুশানকে তার রাইফেলটা হিপোর হাতে তুলে দিতে বলল।

দ্বিধা করতে লাগল নুশান। আবার হুমকি দিল আবীর।

রাইফেলটা হিপোর হাতে দিয়ে দিল নুশান। সেটা দূরে সরিয়ে রেখে সাথে করে নিয়ে আসা দড়ি দিয়ে দুই ভাইয়ের হাত গানলের সঙ্গে কষে বাঁধল হিপো। গুলি খাওয়ার ভয়ে বাধা দিতে পারল না দুই ভাই। কিন্তু রাগে ফুঁসছে।

বাঁধা শেষ করে হিপো সরে দাঁড়ালে

গর্জে উঠল অ্যান্থনি, 'কে তোমরা? কি করছ বুঝতে পারছ?'

'তা পারছি,' তরল কণ্ঠে জবাব দিল হিপো। 'কিন্তু আপনাদের ব্যাপারটা কী? মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে ভূত দেখেছেন।'

ডেকে নামিয়ে রাখা রাইফেলটা পানিতে ছুঁড়ে ফেলল হিপো। বলল, 'এসব বিপজ্জনক জিনিস কাছে রাখা ঠিক না। কখন যে নিজের বিরুদ্ধেই ব্যবহার শুরু হয়ে যাবে, কেউ বলতে পারে না।'

আবীরও তার রাইফেলটা সাগরে ফেলে দিল।

রাইফেল ফেলে দিতেই সাহস ফিরে এল দুই ভাইয়ের। দড়ি খোলার জন্য টানাটানি শুরু করল। অনিক দেখল, কাজ হয়ে গেছে। দ্রুত নৌকা বেয়ে জাহাজের কাছে চলে এল সে। জাহাজের সঙ্গে নৌকাটাকে বেঁধে রেখে কারিনাকে নিয়ে জাহাজে উঠে পড়ল। সোজা ব্রিজে গিয়ে ইঞ্জিন চালু করে দিল কারিনা।

অনিক, আবীর আর হিপো ছুটল অ্যাঙ্কার পয়েন্টের কাছে। মোটর চালু করে দিয়ে নোঙরগুলো তুলে আনতে লাগল। নোঙর পানির ওপরে উঠে আসতেই কারিনার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল অনিক,

'চালান!'

জাহাজটাকে সামান্য এগিয়ে আনল কারিনা।

অ্যাঙ্কার পোস্টে দাঁড়ানো তিন গোয়েন্দা জাহাজের পিছন দিকের রেলিঙের ওপর দিয়ে নিচে তাকাল। সাগরতলে ডুবুরির ডাইভিং লাইটের আলোয় ওইটুকু জায়গার পানির রঙ নীল দেখাচ্ছে। শীঘ্রি পানিতে ভেসে উঠল স্কুবা মাস্ক পরা দুটো মাথা। দুজনকেই চিনতে পারল আবীর। হোয়াইট সোয়ানেরই কর্মচারী। একজন রোজার, দাড়িওয়ালা; অন্যজন গ্রেগ, গোঁফওয়ালা।

'কী ব্যাপার?' জাহাজের দিকে মুখ তুলে হাঁক দিল গ্রেগ।

'জাহাজ সরালে কেন?' রোজারের প্রশ্ন।

'ওরা সরায়নি, আমরা সরিয়েছি,' চেঁচিয়ে জবাব দিল আবীর। 'আপনারা পানিতে নেমেছিলেন কেন?'

চমকে গেল দুই ডুবুরি। আবীরদের দেখে হতবাক।

'এই ছেলেগুলো পিছন থেকে এসে আমাদের চমকে দিয়েছে!' চেঁচিয়ে বলল গানলের সঙ্গে বাঁধা অ্যান্থনি, 'রাইফেল কেড়ে নিয়ে আমাদের বেঁধে ফেলেছে। কারিনা অ্যান্ডারসনকেও সাথে করে নিয়ে এসেছে ওরা।'

আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল কারিনা।

অনিকের ঠিক পিছনেই শব্দ হলো। সে টের পেল, ঠিক তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ। সে ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই পেশিবহুল একটা হাত পিছন থেকে জাপটে ধরল তাকে। দানবীয় বাহুতে টাট্টু দিয়ে একটা নোঙর আঁকা। মুখ না দেখলেও লোকটাকে চিনতে আর অসুবিধে হলো না অনিকের। রিগ মরগান।

একটা ডাইভিং নাইফের শীতল ফলা অনিকের গলায় চেপে ধরল

মরগান। চিৎকার করে আবীর আর হিপোর উদ্দেশ্যে বলল, 'খবরদার, কেউ নড়বে না! তাহলে জবাই হয়ে যাবে তোমাদের বন্ধু।'

পনেরো

অনিকের গলার শিরার কাছ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে রয়েছে ধারাল ছুরির ফলা। নড়া তো দূরের কথা, চোখের পাতা ফেলারও সাহস করছে না সে।

'কেউ নড়ছি না আমরা,' দুই হাত মাথার ওপর তুলে দিল হিপো। 'ওকে কিছু করবেন না। দেখছেন না কেমন পাথর হয়ে গেছি আমরা।'

'পানি থেকে উঠে এসো,' রোজার আর গ্রেগকে বলল মরগান। রাগে জ্বলছে চোখ। আবীর অনুমান করল, মরগানই অপরাধীদের নেতা। পরনে ওয়েট সুটের অর্ধেকটা, অর্থাৎ শুধু নিচের অংশ। সুটের ওপরের অংশটা পরেনি। খালি-গা করে রেখেছে। পিঠে বাঁধা অক্সিজেন ট্যাংক।

রোজার আর গ্রেগের পরনে কমপ্লিট ওয়েট সুট। হোয়াইট সোয়ানের দিকে সাঁতরে এল দুজনে। জাহাজে উঠল।

'নুশান আর অ্যান্থনিকে খুলে দাও!' চেঁচিয়ে আবার হুকুম দিল মরগান। অনিকের গলা থেকে ছুরি সরায়নি। 'রাইফেল নিয়ে এসো।'

'রাইফেল পানিতে ফেলে দিয়েছে ওরা!' অ্যান্থনি জানাল।

'তাহলে স্পিয়ারগান আনো!' মরগান বলল।

আদেশ পালন করল গ্রেগ আর রোজার।

ব্রিজের দিকে চোখ ফেরাল আবীর। কারিনার দিকে তাকাল।

মরগানের দিকে তাকিয়ে আছে কারিনা।

ওর চোখ দেখেই যা বোঝার বুঝে গেল আবীর। জিজ্ঞেস করল, 'কারিনা, কী হয়েছে?'

'সব মনে পড়ে গেছে আমার!' উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিল কারিনা। 'রিগ মরগানের ওখানে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি, ওর জ্বলন্ত চোখ, সেরাতের কথা সব মনে পড়িয়ে দিয়েছে আমার।'

'সত্যি বলছি, কারিনা, তোমার কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছে ছিল না আমার,' মরগান বলল। 'কিন্তু কী করব। আর কোনো উপায় রাখনি তুমি।'

বাঁধনমুক্ত করে দেয়া হয়েছে অ্যান্থনি আর নুশানকে। গ্রেগ আর রোজার স্পিয়ারগান তাক করে রেখেছে আবীর ও হিপোর দিকে। আড়চোখে সেদিকে তাকাল একবার আবীর। আবার ফিরল কারিনার দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'কী ঘটেছিল, খুলে বলুন। কোনো কথা বাদ দেবেন না।' কারিনাকে দিয়ে কথা বলিয়ে শুধু যে সময় নষ্ট করতে চাইছে সে, তা নয়, সুযোগের অপেক্ষাও করছে। তা ছাড়া কী ঘটেছিল সেরাতে, সেটা জানার আগ্রহ তো আছেই।

স্পিয়ারগানের ট্রিগারে শক্ত হয়ে আঙুল চেপে বসল রোজারের। মরগানকে জিজ্ঞেস করল, 'দেব নাকি মেরে?'

'না। এখনও সময় হয়নি,' জবাব দিল মরগান। 'আরেকটু ভেবে নিই।'

কারিনাকে অনুরোধ করল আবীর, 'কারিনা, আপনার কথা বলে-যান।'

'হ্যাঁ, বলছি,' সাগরের শান্ত পানির দিকে চোখ ফেরাল কারিনা।

'কিছুদিন আগে, মানে এই কয়েক সপ্তাহ আগে, জনসন বলেছিলেন মরগানকে, একজন মহিলা নাকি তাঁকে বলেছেন, স্কেলিটন রীফের উত্তর প্রান্তে প্লুটোনিয়াম আছে। চল্লিশ বছরেরও বেশি আগে একটা কিউবান মাছধরা নৌকায় করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ওগুলো। ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায় বোটটা।'

'বলে যান,' কারিনাকে চুপ থাকতে দিল না হিপো।

'ওই মহিলা চেয়েছিলেন জনসন প্লুটোনিয়ামগুলো তুলে এনে তাঁর হাতে দিক,' কারিনা বলল। 'জনসন বলেছেন, মারমেড প্রিন্সেসের কাজ শেষ হয়ে গেলে তিনি চেষ্টা করে দেখবেন। কিন্তু মরগান চাপাচাপি করতে লাগল, তখনই ওগুলো তোলা হোক।'

'কেন?' জানতে চাইল অনিক। ছুরিটা এখনও ধরা রয়েছে তার গলার কাছে।

'আর কেন? বিক্রি করার জন্য,' জবাব দিল কারিনা। 'রাতারাতি ধনী হওয়ার এতবড় সুযোগটা হাতছাড়া করতে চায়নি সে। দলে টানল রোজার, গ্রেগ, নুশান আর অ্যান্থনিকে। প্রতিদিন রাতের বেলা স্কেলিটন রীফের উত্তরে জাহাজ নিয়ে গিয়ে প্লুটোনিয়াম খোঁজে।'

'আপনি এতে জড়ালেন কীভাবে?' হিপো জিজ্ঞেস করল।

'বলো, কারিনা,' মরগান বলল। 'বলতেই যখন চাইছ, পুরো গল্পটাই বলে ফেলো।'

'মরগান আর তার বন্ধুরা পুরো এক হপ্তা ধরে প্লুটোনিয়াম খুঁজে বেড়াল,' কারিনা বলল। 'কিন্তু পেল না। লোক কম। প্রচুর কষ্ট হচ্ছিল ওদের। আরও লোক দরকার। দিন কয়েক আগে মরগান আমাকে জিজ্ঞেস করল, একটা কাজ করে দিতে পারব কিনা। আমি বললাম, পারব।'

'হ্যাঁ, বলেছ,' রুক্ষস্বরে জবাব দিল মরগান। 'কাজেই নিজেকে

নিরপরাধ প্রমাণের চেষ্টা কোরো না, কারিনা।'

'না, করব না। তাহলে আর বলতাম না।' লজ্জিত কণ্ঠে জবাব দিল কারিনা। অনিক আবীর হিপোকে জানাল, 'পকেট একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছিল আমার। বড় কষ্টে দিন কাটছিল, শুধু কলা আর সীমের বিচী খেয়ে। অথচ হাতের কাছেই ছিল কতসব দামী দামী জিনিস। লোভ চাপা দিতে পারলাম না। টাকার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছি তখন। হ্যাঁ, স্বীকার করছি, আমি ওদের দলে যোগ দিয়েছিলাম। বিষ্যুৎবার রাতে ওদের সঙ্গে আমার প্রথম কাজ করার কথা ছিল। ওই রাতে ম্যাসন মোঁপার বাড়িতে কাজ সেরে বন্দরে গেলাম। সেখানে মরগান আর তার দল বোট নিয়ে অপেক্ষা করছিল। বোটে উঠলাম। হোয়াইট সোয়ানে পৌঁছলাম। জাহাজ নিয়ে রওনা হলাম রীফের উত্তর প্রান্তে।'

কারিনা দম নেয়ার জন্য থামতেই অধীর আগ্রহে জানতে চাইল আবীর, 'তারপর?'

'প্লুটোনিয়াম কার কাছে বিক্রি করা যায় এনিয়ে সবাই আলাপ করছিল,' কারিনা বলল। 'ছোট ছোট দেশ, সন্ত্রাসীদের দল এজিনিস কিনতে আগ্রহী। হঠাৎ করেই বোধোদয় হলো আমার, আরে, এ কী করতে যাচ্ছি! ওই প্রথম বুঝলাম, অ্যাটম বোমা বানানোর কাজে সহায়তা করতে যাচ্ছি আমি। এমন একটা জিনিস, যেটা হাজার হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নেবে। বিরাট এক ধ্বংসযজ্ঞে সামিল হতে যাচ্ছি আমি। মহাপাপের অংশীদার!'

'আপনি তখন বেরিয়ে যেতে চাইলেন,' অনিক বলল।

'আমি ওদের বললাম, আমি একাজে সাহায্য করতে পারব না,' কারিনা জবাব দিল। 'ওদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম, কাজটা কতখানি খারাপ। কতটা অন্যায়। কিন্তু টাকার নেশা ওদের মগজ

তখন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমার কথা শুনল না। প্লুটোনিয়াম খোঁজা বন্ধ করতে চাইল না। কোনোমতেই বোঝাতে পারলাম না ওদের। বরং ওরা এমন ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকানো শুরু করল, ভয় পেয়ে গেলাম। ওদের দৃষ্টি দেখে মনে হলো, একদল ক্ষুধার্ত নরখাদকের মাঝখানে ঢুকে পড়েছি আমি।'

'আমাদের সবাইকে ভীষণ এক বিপদের মধ্যে ফেলে দিচ্ছিলে তুমি,' মরগান বলল।

'আমাকে আর বিশ্বাস করতে পারছিল না ওরা,' কারিনা বলল। 'ছাড়তেও পারছিল না, কারণ, আমি ওদের গোপন পরিকল্পনার কথা জেনে গেছি। যদি জনসনকে বলে দিই?' রাগে ভারি হয়ে উঠল কারিনার কণ্ঠ। 'ডাইভিং নাইফ বের করে আমার গলায় ধরল মরগান। ভাবতে পারো? রিগ মরগান, যাকে কিনা বন্ধু ভাবতাম, সে আমাকে জবাই করে মেরে ফেলতে চেয়েছিল!'

'কিন্তু তা তো আর করিনি!' চেঁচিয়ে উঠল মরগান। 'জবাই আমি তোমাকে করিনি। তাহলে এখন ওখানে দাঁড়িয়ে আর কথা বলতে পারতে না।'

'না, পারতাম না!' অতি আবেগে গলা কেঁপে উঠল কারিনার। 'তুমি বলেছিলে, ঠাণ্ডা মাথায় জবাই করে আমাকে খুন করতে পারবে না, আমাকে তুমি পছন্দ করো। তখন অ্যান্থনি আমার দিকে রাইফেল তুলল। কিন্তু সে-ও গুলি করতে পারল না। একে একে সবাই চেষ্টা করে দেখল। দলের কেউই খুন করতে পারল না আমাকে। শেষে মরগান বলল, একটা পথই আছে। তাতে সরাসরি খুন করা হবে না। আমাকে তুলে নিয়ে সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। জাহাজে ওঠার অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু নুশান আর অ্যান্থনি আমাকে উঠতে দেয়নি। রাইফেল হাতে অনবরত হুমকি দিয়ে যাচ্ছিল। বুঝতে

যাচ্ছিল? আস্ত কাপুরুষ সব ক'টা। আরে বাবা, মারবিই যদি মেরে ফেল না! আসলে সামনে দাঁড়িয়ে খুন করার সাহস ওদের ছিল না। কিন্তু কষ্ট পেয়ে ডুবে মরার জন্য সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার মত জঘন্য কাজটা করতে পেরেছিল অনায়াসে।'

'তারপর আপনি সাঁতরানো শুরু করলেন,' হিপো বলল।

'আর কোনো উপায় তো ছিল না,' কারিনা বলল। 'সেইন্ট লুইসের দিকে চললাম। আশা করেছিলাম, কোনো নৌকা কিংবা মাছধরা বোট আমাকে দেখতে পেয়ে তুলে নেবে। কিন্তু ভাগ্য এতই খারাপ, একটা নৌকাও তখন আশেপাশে ছিল না। সুতরাং, সাঁতরাতেই থাকলাম। অনেকটা পথ পারও হয়েছিলাম। তারপর অবশ হয়ে এল শরীর। মাথার মধ্যে হঠাৎ করেই সবকিছু কেমন ফাঁকা হয়ে গেল।'

'তবে সৈকতে পৌঁছতে পেরেছিলেন আপনি,' আবীর বলল।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কারিনা। 'তবে আমি সেটা জানতাম না। শেষ দিকে নিশ্চয় সাঁতারের ক্ষমতা হারিয়েছিলাম। প্রাণ বাঁচানোর প্রচণ্ড তাগিদে কোনোমতে ভেসে ছিলাম পানিতে। ঢেউ আমাকে নিয়ে গিয়েছিল কিনারায়।'

'কেন যেন মনে হচ্ছিল আমার, তুমি ঠিকই ডাঙায় পৌঁছে যাবে,' মরগান বলল। 'বেঁচে যাবে।'

'তাই নাকি?' ব্যঙ্গ ঝরল অনিকের কণ্ঠে। 'আফসোস হচ্ছে!'

ক্ষণিকের জন্য ছুরিটা অনিকের গলায় চেপে বসল। তারপর আবার আগের মত ঢিল করে দিল মরগান। 'আমাকে রাগিয়ে দিয়ো না, খোকা, ভাল হবে না।...কারিনার কথা তো শেষ হলো, এখন আমার কথা বলি। গতকাল আমি সোফ্রিয়ার হাসপাতালে খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, কারিনা নেই। দুটো ছেলে ঘুরঘুর করছে

ওখানে। দুজনই বিদেশী। একজনের চুল কালো। আরেকজনের লালচে। বুঝলাম, ওরাই সেই শখের গোয়েন্দা, যাদের কথা কানে এসেছে আমার।'

'তখন ভয় দেখিয়ে আমাদের তাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন,' আবীর বলল। 'আমরা কোথায় উঠেছি খুঁজে বের করলেন আপনি। জানালা দিয়ে বোতল ছুঁড়ে মারলেন। কাগজে কালো বৃত্ত এঁকে বোতলের ভিতরে ভরে দিলেন। জিনিসটা ভালই পাঠিয়েছিলেন যা হোক।'

'পছন্দ তাহলে হয়েছে,' হাসল মরগান। 'জানতাম, হবে। স্কুলে যখন পড়তাম, ট্রেজার আইল্যান্ড বইটা ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় বই।'

'তাহলে আপনিই সেই উন্মাদ, গতকাল বিকেলে আমাদের সই করে স্পিয়ার ছুঁড়েছিলেন,' অনিক বলল।

'ভাল করে কথা বলো, ছেলে! আমি উন্মাদ?' আবার অনিকের গলায় চেপে বসল মরগানের ছুরির ফলা। 'যাই হোক, আন্দাজটা ঠিকই করেছ। বহুক্ষণ ধরে আমি তোমাদের অনুসরণ করে গেছি। সুযোগের অপেক্ষায় থেকেছি। পাহাড়ের ওপর সেই সুযোগ পেয়েছিলাম। তবে খুন করার জন্য স্পিয়ার ছুঁড়িনি, সাবধান করতে চেয়েছিলাম। খুন করা আসলে আমার ধাতে নেই।'

'কথা তো অনেকই হলো, রিগ,' ধৈর্য হারাচ্ছে রোজার। 'এখন কী করব, সেটা বলো। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

'হ্যাঁ, সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না,' গ্রেগ বলল।

'এই বিচ্ছুগুলোকে মেরে ফেলা ছাড়া গতি নেই,' ভারি কণ্ঠে বলল নুশান। 'নইলে প্লুটোনিয়াম তো পাবই না, জেলেও যেতে হতে পারে আমাদের।'

ভুরু কুঁচকে গেল আবীরের। প্লুটোনিয়ামের লোভে কম কথা বলা

স্বভাবের নুশানেরও মুখ ছুটে গেছে।

'ফেলব তো বটেই,' ভাইয়ের সঙ্গে সুর মিলাল অ্যান্থনি। 'তবে এবার আর আগেরবারের মত ভুল করা চলবে না। পানিতে ফেলার আগেই শেষ করে দিতে হবে, যাতে কারিনার মত সাঁতরে গিয়ে ডাঙায় উঠতে না পারে।'

'জানি! জানি! জানি!' হতাশা আর ক্ষোভে গর্জে উঠল মরগান। চার-চারটে খুন করতে হবে ভেবে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে তার। 'এসব খুনোখুনি আমার পছন্দ হচ্ছে না। তবে এছাড়া আর কোনো উপায়ও দেখতে পাচ্ছি না। কালো বৃত্তকে মনে হচ্ছে এবার বাস্তবেই রূপ দিতে হবে।'

গত কয়েক মিনিট ধরে তুমুল গতিতে ভাবনা চলেছে অনিকের মগজে। ভাবছে, বন্ধুদেরকে সহ নিজেকে কীভাবে এই জট থেকে মুক্ত করা যায়। কীভাবে উদ্ধার পাওয়া যায় বিপদ থেকে। মরগানের টাট্টুটার দিকে তাকিয়ে সমস্যার সমাধান বের করে ফেলল সে। স্থির দৃষ্টিতে আবীরের দিকে তাকিয়ে রইল।

ব্যাপারটা লক্ষ করল আবীর। এভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে কেন অনিক? সে চোখে চোখে তাকাতেই মরগানের টাট্টুটার দিকে চোখ ফেরাল অনিক। তারপর তাকাল নোঙরের দড়িটার দিকে। মরগানের ঠিক পায়ের কাছ দিয়ে চলে গেছে দড়িটা।

অনিক কী বোঝাতে চায়, বুঝে গেল আবীর। সে যে বুঝেছে সেটা বোঝানোর জন্য আস্তে করে মাথা ঝোঁকাল অনিকের দিকে তাকিয়ে।

পা বাড়ালেই নোঙরের লিভারটা পাওয়া যায়। আচমকা এক পা দিয়ে ওটাতে লাথি মারল অনিক। সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন করে উঠল মোটর। নোঙরটা তুলে আনছে ওপরে।

'সাবধান! গলা কেটে যাবে কিন্তু!' চেঁচিয়ে বলল মরগান। সে ভেবেছে, পালাতে চায় অনিক।

ততক্ষণে ওদের কাছে পৌঁছে গেছে আবীর। লিভারটা টান দিয়ে থামিয়ে দিল। তারপর ঠেলে দিল উল্টো দিকে।

চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনাগুলো। মরগান যখন বুঝতে পারল, অনেক দেরি হয়ে গেছে তখন। উল্টোপাল্টা টানাটানিতে অনিকের পায়ে সেদিন যেভাবে দড়িটা পেঁচিয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেভাবেই মরগানের গোড়ালিতেও পেঁচিয়ে গেল দড়িটা। আর্তচিৎকার করে উঠল সে। দড়ির হ্যাঁচকা টানে উল্টে পড়তে শুরু করল। হাত থেকে ছুটে গেল ছুরিটা। ডেকে পড়ে খটাং করে উঠল। কিন্তু ওসব দেখার উপায় নেই এখন মরগানের। নিজেকে বাঁচাতে হিমশিম খাচ্ছে। ডেকের ওপর দিয়ে টানতে টানতে তাকে পুলির দিকে নিয়ে চলল নোঙরের দড়ি।

লিভারটা আবার টান দিল আবীর। থেমে গেল নোঙর। কিন্তু মরগানের পায়ে পেঁচানো দড়িটা নোঙরের ভারে গোড়ালিতে কামড় ঠিকই বসিয়ে রেখেছে। 'উহ্! ব্যথা লাগছে! খোলো!' বলে সমানে চিৎকার করছে মরগান। পা ছাড়ানোর বৃথা চেষ্টা চালাচ্ছে।

লিভারটা ধরে রেখে চেঁচিয়ে আদেশ দিল আবীর, 'স্পিয়ারগান ফেলে লাফ দিন সবাই! পানিতে পড়ুন! আপনারা যত তাড়াতাড়ি ঝাঁপ দেবেন, মরগান তত তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবেন। নইলে দিলাম আবার ঠেলা।'

দ্বিধা করতে লাগল রোজার, গ্রেগ, নুশান ও অ্যান্থনি।

'কী বললাম, শুনছেন না!' আবার ধমকে উঠল আবীর। 'স্পিয়ারগান ফেলুন। ঝাঁপ দিন। নইলে পা হারাবে আপনাদের বন্ধু। ভয় নেই, ঝাঁপ দিলেও পানিতে ডুবে আপনাদেরকে মরতে দেব না

আমরা।'

'যা বলে করো না কেন!' চেঁচিয়ে বলল মরগান। যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগল।

'কিন্তু, রিগ...' বলতে যাচ্ছিল গ্রেগ।

'দোহাই তোমাদের!' ককিয়ে উঠল মরগান। 'কথা বাড়িও না। যা বলছে করো। জলদি! আমি আর সহ্য করতে পারছি না!'

স্পিয়ারগান দুটো ডেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল রোজার আর গ্রেগ। তারপর পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওদের পর পর গেল নুশান ও অ্যান্থনি।

লিভারটা উল্টো দিকে ঠেলে দিল আবীর। আবার উঠে এল নোঙরের দড়ি। ঢিল হয়ে গেল মরগানের গোড়ালির চাপ। অনিকের মনে হলো, যতটা কাতরাচ্ছে ততটা জখম হয়নি মরগান। কারণ, তার গোড়ালি ঢাকা রয়েছে ওয়েট সুটের পুরু রবারে।

'কাজটা করতে ভাল লাগছে না আমার, কিন্তু করতেই হচ্ছে,' বলে মরগানের এক হাত চেপে ধরল অনিক। আবীর এসে ধরল অন্য হাত। মরগানকে তুলে ডেক থেকে পানিতে ছুঁড়ে দিল দুজনে। কিন্তু পড়ার আগ মুহূর্তে শূন্য থেকেই থাবা দিয়ে অনিকের একটা হাত ধরে ফেলল মরগান। সামলাতে পারল না অনিক। মরগানের সঙ্গে সে-ও পানিতে পড়ল। দুদিক থেকে এসে অনিককে চেপে ধরল অ্যান্থনি ও নুশান। মুখটা পানির নিচে চেপে ধরল। শ্বাসরোধ করে মারার জন্য।

'এইটা হলো ওর উচিত সাজা,' পানিতে মাথা উঁচিয়ে বলল গ্রেগ।

ডেক থেকে স্পিয়ারগান দুটো তুলে নিল হিপো। একটা আবীরকে দিয়ে অন্যটা নিজের হাতে রাখল। মুখের মুখোশ টান দিয়ে নামিয়ে নিল দুজনে। মাউথপিস মুখে ঢোকাল। তারপর স্পিয়ারগান

হাতে ঝাঁপ দিল পানিতে।

কোমরের ওয়েট বেল্ট আপনাআপনি পানির নিচে টেনে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আবীরকে। পানির নিচে ডাইভিং লাইটের ভূতুড়ে কাঁপা আভায় সে দেখল, অনিককে কীভাবে ধরে রেখেছে দুই ভাই। দুই গাল ফুলে উঠেছে অ্যান্থনি ও নুশানের। ছাড়া পাওয়ার জন্য ছটফট করছে অনিক। পানিতে পড়ার জন্য তৈরি ছিল না সে। তাই ফুসফুসে বাতাস নেই। বেশিক্ষণ ডুবে থাকতে পারবে না। মরিয়া হয়ে উঠেছে বাতাসের জন্য। পানিতে লাথি মেরে ভেসে উঠতে চাইছে।

নুশানকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ল আবীর। মারার জন্য নয়। যেখানে লাগাতে চেয়েছে, পানি কেটে গিয়ে ঠিক সেখানেই লাগল বর্শাটা। প্যান্ট ফুটো করে মাংসে বিঁধে গেল। প্রবল প্রতিক্রিয়ায় সঙ্গে সঙ্গে অনিককে ছেড়ে দিয়ে নিজের গায়ে বেঁধা বর্শা খোলায় ব্যস্ত হলো নুশান। সুযোগটা কাজে লাগাল অনিক। পানিতে ডিগবাজি খেয়ে ঘুরে গেল। গায়ের জোরে অ্যান্থনির বুকে লাথি মেরে নিজেকে মুক্ত করে নিল। পাগলের মত হাত-পা নেড়ে মাথাটা ঠেলে তুলতে শুরু করল ওপর দিকে।

আবীরকে লক্ষ্য করে থাবা মারল একটা হাত। ওর মাউথপিস ছিঁড়ে ফেলল। হাতটা রিগ মরগানের। আবীরের কাঁধ চেপে ধরে টান দিয়ে ঘুরিয়ে ফেলল নিজের দিকে। ট্যাংক থেকে অক্সিজেন নিচ্ছে মরগান। কিন্তু আবীর নিচ্ছে নিজের ফুসফুস থেকে। অতি সামান্যই অক্সিজেন অবশিষ্ট আছে তার ফুসফুসে।

স্পিয়ারগানের বাট দিয়ে সজোরে মরগানের বুকে গুঁতো মারল আবীর। টান দিয়ে তার হাত থেকে গানটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল মরগান। সাহায্যের আশায় হিপোর দিকে ঘুরে তাকাল আবীর। সাহায্য করার অবস্থায় নেই তখন হিপো। অন্য অপরাধীদের সঙ্গে

লড়াই করতে ব্যস্ত। আর, অনিককে কোথাও চোখে পড়ছে না।

শক্ত করে আবীরকে ধরে রেখেছে মরগান। নড়তে দিচ্ছে না। অক্সিজেনের অভাবে চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল আবীরের।

কিন্তু মরগান ওকে ছাড়ল না। সাঁড়াশির মত কঠিন আঙুলে গলা টিপে ধরল।

আবীরের মনে হলো, তার ফুসফুসটা ফেটে যাবে।

ঘোলাটে হয়ে আসছে দৃষ্টি। মাথার ভিতরটা কেমন ফাঁকা। নিচে এক ঝাঁক লাল রঙের মাছ চোখে পড়ল তার। পরক্ষণে বুঝে গেল ভুলটা। মাছ না! প্রবাল! মরগানের হাত থেকে নিজেকে ছাড়ানোর বুদ্ধি এল মাথায়। গায়ে যতখানি জোর অবশিষ্ট আছে, সবটুকু একত্রিত করে মরগানকে টেনে নিয়ে চলল নিচের দিকে।

হঠাৎ করেই আবীরকে ছেড়ে দিল মরগান। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। খোলা পিঠে তীক্ষ্ণধার প্রবালের ঘষা খেয়েছে। ছাড়া পেয়ে একটা মুহূর্ত দেরি করল না আবীর। পায়ের ফিন নেড়ে দ্রুত ওপরে উঠতে শুরু করল।

অনিক তখন হিপোকে সাহায্য করার জন্য নিচে নামছিল। হিপোকে ঘিরে ধরেছে রোজার, গ্রেগ, নুশান আর অ্যান্থনি। শেষ বর্শাটা ছুঁড়ে মারল হিপো। লাগল গ্রেগের এক পায়ের ফিন-এ। হিপোর বর্শা শেষ হয়ে গেছে দেখে একযোগে তাকে আক্রমণ করতে এগোল চারজনে। কিন্তু নতুন করে আক্রান্ত হলো অনিকের দিক থেকে। কারিনার দেয়া নতুন বর্শা লোড করা আরেকটা স্পিয়ারগান নিয়ে হাজির হয়েছে অনিক। ছুঁড়তে শুরু করল শত্রুদের দিকে।

এভাবে আবার আক্রান্ত হবে ভাবেনি শত্রুরা। ক্ষণিকের জন্য থমকাল ওরা। এই সুযোগ ওপরে উঠতে শুরু করল হিপো। ওদের ঘের থেকে বেরিয়ে চলে এল। বর্শা নিক্ষেপ বন্ধ করল না অনিক।

গায়ে লাগার ভয়ে এদিক ওদিক সরে যেতে শুরু করল চার শত্রু। ওদেরকে ভড়কে দিয়ে হিপোকে নিয়ে আবার ওপরে উঠে যেতে লাগল অনিক।

পানির ওপর হুস করে মাথা তুলল দুজনে। আবীর তখন পানিতে ডুব দিতে তৈরি হচ্ছে আবার। ওকে যেতে মানা করল অনিক। তাড়াহুড়া করে জাহাজে উঠে পড়ল তিনজনে। দ্রুত নোঙর তুলে নিল। জাহাজ সরিয়ে নিতে শুরু করল কারিনা। পানির ওপর তখন এক এক করে কর্কের ছিপির মত লাফ দিয়ে দিয়ে মাথা তুলছে পাঁচ শত্রু।

'থামো! থামো!' চিৎকার করে উঠল রোজার। 'এভাবে ফেলে যেয়ো না আমাদেরকে। মরে যাব। আর মাত্র কয়েক মিনিটের বাতাস আছে ট্যাংকে। তীরে পৌছতে পারব না।'

'দোহাই তোমাদের! প্লিজ!' গ্রেগ বলল।

'বোঝো এখন, কেমন লাগে!' ব্রিজ থেকে চেঁচিয়ে জবাব দিল কারিনা। 'খুব ভয় লাগছে, তাই না?'

'আমাকে মাপ করে দাও, কারিনা!' মরগান বলল। 'আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি।'

'তাই নাকি?' ব্যঙ্গ ঝরল আবীরের কণ্ঠে। 'চুপ করে ভেসে থাকুন। চেঁচিয়ে শুধু শুধু শক্তি খরচ করবেন না। আপনাদের মত নিষ্ঠুর নই আমরা। রেডিওতে পুলিশকে জানিয়ে দেব। ওরা এসে তুলে নেবে আপনাদের। হাতে যখন হাতকড়া পরাবে, তখন যা বলার বলবেন ওদের।'

কিন্তু চিৎকার করে কাকুতি-মিনতি করতেই থাকল মরগান আর তার সহচররা। ওদের বিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। সাপকে বিশ্বাস করা যায়, তবু ওদেরকে না। জাহাজে উঠেই আবার হামলা চালাবে,

জানা কথা। দেখতে দেখতে এতটা সরে চলে এল জাহাজ, ওদের চিৎকার আর শোনা গেল না।

রেডিওতে পুলিশকে খবর দিল কারিনা। পুলিশ জানাল, মরগানদের তুলে নেয়ার জন্য একটা বোট নিয়ে রওনা হচ্ছে।

ক্যারিবীয় সাগরের শান্ত জলরাশি ভেদ করে এগিয়ে চলেছে জাহাজ। ব্রিজে কারিনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আবীর ও হিপো। আকাশের বাঁকা চাঁদের দিকে মুখ তুলে তাকাল আবীর। অবশেষে কমে এসেছে উত্তেজনা। দেহের শিরায় শিরায় অ্যাড্রিনালিন প্রবাহের মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে এল।

'জানো,' বাতাসে উড়ছে কারিনার লম্বা চুল, 'জনসন ঠিকই বলেছিলেন। গুপ্তধনের গন্ধ উন্মাদ করে তোলে মানুষকে। আমিও রেহাই পাইনি। তবে শিক্ষা হয়ে গেছে আমার। অনেক ধন্যবাদ তোমাদের।'

'এখন, রহস্যটার সমাধান যেহেতু হয়ে গেছে,' হাসিমুখে হিপো বলল, 'অনিক-আবীরকেও আশা করি কয়েক দিনের জন্য শান্ত রাখতে পারব।'

'আমিও শান্ত থাকতে চাই,' হিপোর হাত ধরে মৃদু চাপ দিল আবীর। 'বাপরে বাপ! যে ঝামেলা গেল!'

নিচে তাকাল সে। সামনের দিকে গানলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনিক। জাহাজের পাশ দিয়ে কেটে যাওয়া কালো পানির দিকে চোখ।

ব্রিজ থেকে নেমে তার দিকে এগোল আবীর।

'কী ভাবছিস?' কাছে এসে অনিককে জিজ্ঞেস করল সে।

'অ্যাঁ! কিছু না।'

'কিছু তো ভাবছিস বটেই। কী, বল আমাকে।'

ফিরে তাকাল অনিক। 'ভাবছি, একটা রহস্যের সমাধান তো করলাম। আরও কত রহস্য লুকিয়ে আছে ওই স্কেলিটন রীফের পানির নিচে?'

'থাকলে থাকুক,' অধৈর্য কণ্ঠে জবাব দিল আবীর। 'যদি কোনো রহস্য খুঁজেও পাস, আপাতত সেটা প্রকাশ করিস না। আমি এখন ছুটিতে। আর ঝামেলা করতে পারব না।'

হাসল অনিক। 'তারমানে প্রকাশ করলেই যত সমস্যা?'

'হ্যাঁ।'

-: শেষ :-

বইটি কেমন লাগল তোমাদের, লিখে জানাও।

তোমাদের চিঠি সরাসরি পৌঁছে দেয়া হবে লেখক রকিব হাসানের হাতে।

'তোমাদের চিঠি' বিভাগে প্রশ্নের জবাব দেবেন রকিব হাসান।

যোগাযোগ ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা:

কথামেলা প্রকাশন

৩৮/৪ (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।

*** 02-03-08 Shaoun

তোমাদের চিঠি

সেতু
পাবনা সদর, পাবনা।
০ প্রিয় রকিবদা, প্রথমেই আমার শুভেচ্ছা নেবেন। 'ভিনগ্রহের পিশাচ' ও 'নীল যোদ্ধা' বই দুটির মত ভাল বই এর আগে পড়েছি বলে মনে হয় না। 'নীল যোদ্ধা' বইটি এত ভাল লেগেছে যে ৫ বার পড়ে ফেলেছি। আমি 'তিন গোয়েন্দা'র অন্ধ ভক্ত ছিলাম, সেই সাথে 'তিন বন্ধুর'ও। আপনি লেখা ছেড়ে দিয়েছেন শুনে এত খারাপ লেগেছিল যে কী বলব। আপনার নতুন বইগুলো হাতে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। এখন অপেক্ষায় আছি কবে 'ভারেকের থাবা' বেরোবে।
০০ তোমাকেও শুভেচ্ছা। ফেব্রুয়ারির বইমেলায় পেয়ে যাবে 'ভারেকের থাবা'।

ফাতেমাতুজ জোহরা (লিমা)
উপশহর হাউজিং এস্টেট, রাজশাহী।
০ প্রিয় রকিবদা, আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা নিবেন। উফ! রকিবদা, কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দিব বুঝতে পারছি না। আপনার 'মৃত্যুমুখোশ' ও 'হীরার চোখ' বই দুটো এত এত এত ভাল লেগেছে যে প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই। আপনার লেখা আবার পড়তে পেরে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি। আশা করি 'তিন গোয়েন্দা'র মত 'কিশোর গোয়েন্দা' সিরিজটিও আবার হুট করে ছেড়ে দেবেন না। দিলে, শিওর, আপনার কোর্ট মার্শাল হয়ে যাবে। আপনার বিচার করব স্বয়ং আমি!
০০ ওরিব্বাবা! কোর্ট মার্শাল! না না, ভাই, কিশোর গোয়েন্দা জীবনেও বন্ধ করব না।

আশিক
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
০ রকিব আংকেল, আমার শুভেচ্ছা নেবেন। 'মৃত্যুমুখোশ' ও 'নীল যোদ্ধা' এইমাত্র শেষ করলাম। অনেক অনেক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন এই লেখার জন্য। এত ভাল লাগার পরও বলব যে কিশোর পাশাকে ভুলতে পারছি না।

০০ শুধু পুরানোকে নিয়ে পড়ে থাকলে নতুনের জন্ম হতো না। অভ্যস্ততাও একটা বিরাট ব্যাপার। প্রথমেই তো স্বীকার করে নিলে 'কিশোর গোয়েন্দা' সিরিজের 'মৃত্যুমুখোশ' ও 'কিশোর সাইন্স ফিকশন' সিরিজের 'নীল যোদ্ধা' ভাল লেগেছে। ভাল লাগাটাই হলো আসল কথা, সেটা যে বইই হোক। 'ক্যারিবিয়ানের জলদস্যু' কেমন লাগল জানিয়ো।

দেবাশীষ
মুন্সিপাড়া, খুলনা।
০ প্রিয় ভাই, আমার একটা অভিযোগ আছে। খুলনার মত শহরে থেকেও কেন কথামেলা প্রকাশনের বই পাচ্ছি না জানাবেন কি? আপনাদের বই খুলনার কোন কোন দোকানে পাওয়া যায়? আর দোকান থেকে না কিনে যদি সরাসরি মানি অর্ডার করে টাকা ও বইয়ের নাম পাঠাই, তবে কি বাড়িতে বসে বই পাব?
০০ পাবে। ১০০.০০ (একশো) টাকা পাঠিয়ে 'ঘরে বসে বই' বিভাগের সদস্য হয়ে যাও। কোন কোন বই লাগবে (১০০.০০ টাকার মধ্যে) লিখে জানাও। ঠিকানা ভুল লিখবে না। স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখবে, যাতে পড়তে অসুবিধে না হয়। ১০০.০০ টাকা শেষ হয়ে গেলে নতুন করে টাকা পাঠাতে হবে। বিস্তারিত জানতে হলে 'কথামেলা প্রকাশন'-এর সঙ্গে যোগাযোগ করো।

মোঃ জহির মাহমুদ (মাহী)
ঘোড়ামারা, রাজশাহী।
০ রকিব আংকেল, এইমাত্র আপনার 'নীল যোদ্ধা' শেষ করলাম। এক কথায় বইটি দারুণ হয়েছে। আপনার নতুন সিরিজ 'কিশোর গোয়েন্দা'র বইগুলোও অতুলনীয়। কিন্তু তারপরও বার বার তিন গোয়েন্দার কথাই মনে পড়ে। 'কিশোর সাইন্স ফিকশনে' অবশ্য কিশোর মুসা রবিনকে ছদ্মনামে ফিরিয়ে এনেছেন। তাতে শোক কিছুটা কমেছে। এই সিরিজটা কত খণ্ডে শেষ করার পরিকল্পনা করেছেন জানাবেন। চিঠিটা ছাপানো আপনার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিলাম। তবে না ছাপালে রাগ করব।
০০ নাও, দিলাম ছেপে। এমনিতেই শোকের মধ্যে আছো, আরও রাগিয়ে দেয়ার সাহস হলো না। পরিকল্পনা তো ধারাবাহিকভাবে চালানোর। দেখি, কতখানি পারি।

মোঃ শাওন হোসেন রাজু
বোয়ালমারী, ফরিদপুর।
০ রকিবদা, সেবা প্রকাশনীর মত আপনারাও সদস্য বিভাগ চালু করুন না। তাতে ঘরে বসে বই পেতে সুবিধে হবে। 'কিশোর গোয়েন্দা' ও 'কিশোর সাইন্স ফিকশন' সিরিজ আশা করি বন্ধ করবেন না?

০০ চালু করলাম। আমাদের এই সদস্য বিভাগটির নাম **'ঘরে বসে বই'**। কিশোর গোয়েন্দা ও কিশোর সাইন্স ফিকশন সিরিজ বন্ধ হবে না।

শরীফ আহমেদ
গণকটুলী লেন, ঢাকা।
০ রকিব মামা, কথামেলা থেকে প্রকাশিত আপনার 'কিশোর গোয়েন্দা' সিরিজের বইগুলো খুব ভাল লাগল। তবে বেশি ভাল লেগেছে 'কিশোর সাইন্স ফিকশন'। এই সিরিজের চরিত্র নিমো, জামবু, সিসি, তিয়াপা, জিউসকে যথাক্রমে তিন গোয়েন্দার চরিত্র ছদ্মবেশী কিশোর, মুসা, রবিন, জিনা ও জ্যাক ভাবতে কোনো অসুবিধেই হয়নি। আশা করি আমার অনুমান ঠিক?
০০ যা খুশি অনুমান করো, কিন্তু আমি ওদের নাম ফাঁস করতে পারব না। কোনভাবে যদি 'ভিকুন থ্রী'র কানে কথাটা চলে যায়, রক্ষা নেই। হয় চরিত্রগুলোকে ধরে খুন করবে, নয়তো গোলাম বানাবে। 'নীল যোদ্ধা'র আড়ালে আসল নামগুলো গোপন করে রাখার জন্য আমাকেও ছাড়বে না ওই ধেড়ে ভিকুন।

তূর্য
নয়াপল্টন, ঢাকা।
০ রকিব আঙ্কেল, প্রথমে আমার সালাম নিবেন। 'ড্রাগনের নিঃশ্বাস', 'ভিনগ্রহের পিশাচ' এবং আরও বই পড়েছি। আমি আপনার খুবই ভক্ত একজন পাঠক। তবে আমার খুব খারাপ লেগেছে যখন নিমোকে আপনি 'ভাগো' বানালেন, কিন্তু পরে খুব মজা লাগল। 'হিমছড়ির দানব' কিনেছি, কিন্তু পড়িনি। কারণ আমি শুনেছি ওটা নাকি খুব ভয়ের। আমি অনেক ভীতু আর আমার বয়েস ৭ বছর।
০০ আশা করি ভয়টা কাটিয়ে উঠে বইটা পড়ে ফেলেছ। কারণ ইতিমধ্যে বয়েস কয়েক মাস বেড়েছে তোমার, সেই সাথে সাহসও বেড়েছে নিশ্চয়।

'কথামেলা প্রকাশন'-এর আগামী ক'টি বই:

কিশোর গোয়েন্দা
শিকারী বাজ
রকিব হাসান

চোখের পলকে থাবা দিয়ে উড়ন্ত পায়রাটাকে ধরে ফেলল শিকারী বাজ। নামিয়ে আনল নিচে। পায়রার পায়ে বাঁধা এক রহস্যময় চিঠি। খুলে নিল আবীর। সাঙ্কেতিক অক্ষরে লেখা মেসেজ পড়ে চমকে গেল তিন কিশোর গোয়েন্দা অনিক আবীর হিপো। ভয়ঙ্কর একদল অপরাধীর পিছু নিয়ে ভয়াল 'সিংহ পর্বত'-এ পাড়ি জমাল ওরা। কাদের বিরুদ্ধে লেগেছে বুঝতে সময় লাগল। যখন বুঝল, দেরি হয়ে গেছে, পিছিয়ে আসার সব পথ রুদ্ধ।

কিশোর গোয়েন্দা
কানা কুমিরের গুপ্তধন
রকিব হাসান

পোকা-মাকড়, পাখি ও কুমিরে ভরা রহস্যময় এক জলাভূমির নাম ফ্লোরিডা এভারগ্লেড। মহাবিপদে পড়ল সেখানে কিশোর গোয়েন্দা অনিক আবীর ও হিপো। জলাভূমিতে ডুবিয়ে দেয়া হলো ওদের বোট। চোরাকাদায় ফেলে খুন করতে চায় কেউ। শত্রুতা করতে ছাড়ল না ভয়ঙ্কর এক কানা কুমির ও মানুষখেকো হাঙরের ঝাঁক। দিশেহারা এখন কিশোর গোয়েন্দারা। তবে, যত যাই ঘটুক, রহস্যের সমাধান না করে থামবে না ওরা।

রোমান্টিক থ্রিলার
পাপের হাসি
রকিব হাসান

যত নষ্টের মূল এক ব্যাগ ভর্তি টাকা। কলেজে পড়ুয়া দুই বান্ধবী তিশা ও রেহানা প্রতিজ্ঞা করল, কথাটা দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে, তৃতীয় আর কাউকে জানাবে না। কিন্তু তিশাকে মুখ খুলতে বাধ্য করল ওদেরই কলেজের ছাত্র আমীর। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল রেহানা। আমীরকে বিশ্বাস করে না সে। টাকার জন্য সব করতে পারবে আমীর, এমনকী খুন করতেও হাত কাঁপবে না।

গাজীপুরে করিম শেখের ভূতুড়ে জঙ্গলে পচা দীঘির ভয়ঙ্কর পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হলো সদ্য খুন করা লাশ। জমে উঠল রোমাঞ্চকর নাটক।

কিশোর সাইন্স ফিকশন

ভারেকের থাবা

রকিব হাসান

ভিন্ন কোন আজব গ্রহে যদি দলছুট হয়ে একাকী নেমে পড়তে বাধ্য হও তুমি, কেমন লাগবে? পাগল হয়ে যাবে না? কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রাখল জিথারিয়ান স্পেসফাইটার কিশোর টিটুন। ডোম শিপ ধ্বংস করে দিয়েছে ভারেকরা, ওর ভাই প্রিন্স ফুকটুনকে খুন করেছে ভিকুন থ্রী। এক অসম্ভবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল টিটুন। পাশে এসে দাঁড়াল 'নীল'-এর অন্য পাঁচ সদস্য ক্যাপ্টেন নিমো, মডেল তিয়াপা, ফাইটার জামবু, ওয়ার্ডেন সিসি ও আজব মানুষপাখি পাইলট জিউস। ভারেকদের ঠেকাতে না পারলে পৃথিবী টিকবে না, কিংবা টিকলেও স্বাভাবিক মানুষ থাকবে না আর কেউ।

'কিশোর মুসা রবিনের সিরিজ':

বাংলাদেশ থেকে আলাস্কা

রকিব হাসান

বাংলাদেশে নতুন হেডকোয়ার্টার, ওকিমুরো কর্পোরেশনের শাখা অফিস আর 'প্রিয়টিভি' নামে ছোটদের জন্য একটা টেলিভিশন চ্যানেল প্রতিষ্ঠার মহাপরিকল্পনা নিয়ে ঢাকায় এসেছিল তিন গোয়েন্দা কিশোর পাশা, মুসা আমান ও রবিন মিলফোর্ড। বাদ সাধল ওদের বন্ধু বিড হুফার। সুদূর আলাস্কা থেকে এল তার টেলিফোন: জলদি এসো! ভীষণ বিপদ! মরতে বসেছি! রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। ঢাকা থেকেই পিছু নিল শত্রু। পদে পদে বাধা আর আক্রমণ। মৃত্যুর ঝুঁকি। ইন্ডিয়ান কিশোর ডায়মন্ডহার্টের সঙ্গে ক্যানুতে করে আলাস্কার দুর্গম অঞ্চলে পাড়ি জমাল ওরা, যেখানে রয়েছে ইন্ডিয়ানদের অতি প্রাচীন গোরস্থান আর শয়তানের তৈরি পাঁচ আঙুলে পর্বত। কুনিয়াক নদী বেয়ে এল স্যামনের ঝাঁক। পেছনে লাগল মৎস্যলোভী অতিকায় ভালুক ও মাছশিকারী চোরের দল। কিন্তু রহস্যময় পাহাড়ের কন্দরে বাজনা বাজায় কিসে? শিউরে উঠল ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী মুসা আমান, ডায়মন্ডহার্ট ও নেড। মূল্য: ৭৫.০০ টাকা।

কিশোর থ্রিলার

কিশোর গোয়েন্দা

ক্যারিবিয়ানের জলদস্যু

রকিব হাসান

ঝলমলে রোদ, সাদা বালি আর নীল সাগরের
দেশ ক্যারিবিয়ানে বেড়াতে এসেছে
তিন কিশোর গোয়েন্দা অনিক আবীর হিপো।
চাঁদনী রাতে দ্বীপবাসী এক বৃদ্ধার মুখে শুনল ভূতের গল্প।
তারপর সৈকতের কিনারে পড়ে থাকতে দেখল ভূতটাকে।
কিন্তু কে এই রহস্যময়ী নারী?
কার কাছ থেকে কী গোপন করছে?
তিন গোয়েন্দা বুঝল, সব প্রশ্নের জবাব লুকিয়ে আছে
রহস্যময় স্কেলিটন রীফে, যেখানে জলদস্যুদের গুপ্তধন
উদ্ধারে ব্যস্ত একদল 'আধুনিক জলদস্যু',
যেখানে পানির নিচে অনবরত টহল দিয়ে বেড়ায়
মানুষখেকো হাঙর।
চরম দুঃসাহসে বুক বেঁধে মৃত্যুর মুখোমুখি হলো
তিন রহস্যভেদী।

কথামেলা প্রকাশন
৩৮/৪, (৩য় তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা।